গৃহীসাধক শ্রীনিবাস

দেবী চট্টোপাধ্যায়

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণঃ বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৬৮
ইং ১৯শে এপ্রিল, ১৯৬১

প্রকাশক—
সুরেশ দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ
রাজেন চক্রবর্তী

মূল্য- -৬'০০

মুদ্রাকর :
শিবব্রত ভট্টাচার্য
জোনাকি প্রেস
৭৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

এক

মেয়ের মত মেয়ে। জগৎ আলো করা রূপ। যেন সাক্ষাৎ কমলা আপন সৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করতে, আলোয় আলোময় করতে নেমে এসেছেন ধরার ধুলোয়।

এত রূপ সাধারণ এক মধ্যবিত্ত সংসারে কোথা হতে পেল মেয়েটা!

পলে পলে দিন অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে আপন গতিতে। মেয়ের যত বয়স বাড়ে ভাবনাও তত বাড়তে থাকে যাজি গ্রামের সরল ব্রাহ্মণ বলরাম আচার্য্যের।

না, আর দেরি করা চলে না। মেয়ে আর ছোট্টটি নেই। লক্ষ্মীপ্রিয়া এখন দিনে দিনে কলায় কলায় পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু বেশিদিন ভাবতে হয় না বলরামকে। কন্যা লক্ষ্মীর যোগ্য পাত্র যেন পূর্ব হতেই ঠিক করা ছিল। দু'এক জায়গায় খোঁজ খবর করতে করতেই খোঁজ পেয়ে যান তিনি।

চাকন্দি গ্রামের ভট্টাচার্য্য বাড়ির ছেলে। ধর্মকর্ম নিয়ে সব সময় থাকে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। ছেলেটি ভালই। নাই বা রইল তার গোয়ালভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধান, প্রাসাদোপম অট্টালিকা। খাওয়া পরার তো কোন অভাব নেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ফর্সা গঙ্গাধর দেখতে শুনতেও ভাল। বলরাম আচার্য্য সবদিক ভেবে-চিন্তে চাকন্দি গ্রামের ঐ গঙ্গাধর ছেলেটিকেই কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার যোগ্য হিসাবে জামাতা নির্বাচন করেন শেষঅব্দি।

এরপর একদিন ব্রাহ্মণের মেটে ঘরের শুভ্র চিত্রিত আলপনায় বেজে উঠে শাঁখ। কলস্বরে ধ্বনিত হয় মাঙ্গলিক উলুধ্বনী। সূচিত হয় এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের পথরেখা।

পরম আনন্দে প্রথম কয়েকটা বছর কেটে যায় দু'জনার। কিন্তু তারপরই কি যেন হয়ে যায়। লক্ষ্মীপ্রিয়ার অহরহ কিসের একটা অভাব যেন তাঁকে কাঁটার মত খোঁচায়। সুখ নেই, সুখ নেই তাঁর মনে।

দুই

গঙ্গাধর এসবের কোন খোঁজই রাখে না। সে সব সময় উদাসীন, নিরাসক্ত। ভজন সাধনে মগ্ন। নিবিষ্ট মনে হৃদয়ের পাল্লা গুলি খুললেই সে যেন কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। ঘন ঘোর তমিস্রার বুক চিরে জ্যোতির্ময় আলোর হাতছানি তাকে সমাজ, সংসার বন্ধন সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।

চোখের উপর তার ভাসতে থাকে মনের পটে আঁকা কাটোয়ার কেশব ভারতী আশ্রমের সেই ভুবন ভোলানো সন্ন্যাসীর ছবি। চোখ বন্ধ করলেই সে দেখতে পায়—পরনে গৈরিকবাস, এক হাতে কমণ্ডলু আর হাতে দণ্ড; আজানুলম্বিত বাহু সন্ধিতে বৈরাগীর ঝোলা আর মুণ্ডিত মস্তকে নবনীত কোমল দেবমূর্তি অধরে স্মিত হাসি নিয়ে হাসছে। দেখে আর সাধ মেটে না। কারই বা মেটে! এযে আমার প্রেমের রাজা গোরা, প্রাণ ভোমরা ন'দের দুলাল গোরা।

পারিপার্শ্বিকতা ছাড়িয়ে বাহ্যিক চেতনাশক্তি তাকে মাঝে মাঝে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অজানার উজানে। উদাসীনতা বাড়ে বই কমে না।

গঙ্গাধরের তবু পানকৌড়ির মত টুপ্ টুপ্ করে নিজের মাঝে ডুব দিয়ে সময় কাটে। কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়ার সময় কাটে কিভাবে! নির্জন নিরালা প্রহর এক এক সময় বড় বেশি ভাবিয়ে তোলে তাকে। জেগে উঠে তার মধ্যে সেই চিরন্তন নারীসত্ত্বা। যে নারী জননী—জায়া—সখা।

বিয়ের পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া এখন পূর্ণ যৌবনা। মায়াময় দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে তার প্রস্ফুটিত দেহবল্লরী ঘিরে। কিন্তু এই রূপ অপরূপা হতে গেলে যে কোল আলো করা একটি শিশু চাই। মন তাই তার উন্মনা। প্রায়শই এ অভাব তাকে পীড়িত করে। মন যে মানে না। মনে তার বড় দুঃখ।

গঙ্গাধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা একদিন—তাকে নাড়া দেয়—হ্যাঁরে গঙ্গাধর! তুই বিয়ে করছিস। বউ নিয়ে ঘর করছিস; দিনরাত তোর কি শুধু হরিনামের পাগলামি করলেই চলবে? সংসারের কথা ভাবতে হবে না? সংসারটা দেখতে হবে না?

—কেন, লক্ষ্মী তো রয়েছে। সব ভার মাথায় নিয়ে সংসার ওই তো দেখছে। ওই দেখবে।

প্রতিবেশিনী বিরক্ত হয়। মরণ আমার! তবে আর বলছি কি? লক্ষ্মীর কথাই তো বলছি।

গঙ্গাধর ফ্যালফ্যালিয়ে তাকায়;—কেন কি হয়েছে তার? কিছু কি আপনাকে বলেছে?

—হবে আমার মাথা। বলি বলতে হবে কেন। যার চোখ থাকে সেই দেখতে পায়। তোর চোখ থাকলে তো দেখবি। মন থাকলে তো বুঝবি কি হয়েছে। কি সুবিধা, কি অসুবিধা। কি না হলে চলে না। দেখছিস না জওয়ান মেয়ে। দুকুল ছাপিয়ে এখন বর্ষার নদী। একবার ভাল করে তাকিয়েছিস তার দিকে। বিয়ে তো অনেকদিন হল। এবার একটা ছেলেপুলে না হলে কি আর চলে।

বৃদ্ধার মুখে কোন সংকোচ নেই। মনের কথাটা বৃদ্ধার জিভ দিয়ে খাপখোলা তরবারির মত আচমকা এভাবে বেরিয়ে আসবে জানতো না লক্ষ্মীপ্রিয়া। সে তো বৃদ্ধাকে কিছু বলেনি। ছিঃ ছিঃ মানুষটা কি মনে করবে। মেয়েদের এই এক জ্বালা। মনের ডালা মেলে ধরলেই এক রাশ লজ্জা। শুধু লজ্জা আর লজ্জা।

লজ্জায় জিভ কেটে দীর্ঘ ঘোমটা টানে লক্ষ্মীপ্রিয়া। বৃদ্ধা বলে—মরি, মরি! আর ঘোমটা টানতে হবে না। ঘোমটায় মুখ ঢাকলেই কি মন ঢাকা যায় লো।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় গঙ্গাধরের কাছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার লজ্জার সাথে সাথে বৃদ্ধার বক্তব্য বুঝতে পেরেই হো-হো-হো-হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে সে।

বৃদ্ধার সেদিনের সে বক্তব্য উদ্দাম হাসির সাথে সাথে মন হতে কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায় না। মুছে যায় না। দাগ রেখে যায় একটা।

'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা' কাল প্রবাহে এই জাগতিক কামনা তার নিস্তরঙ্গ মনেও শেষ পর্য্যন্ত ঢেউ তোলে।

চার

বুঝতে পারে না সে একি তার ভাবান্তর। একি নবচেতনা। ভাবে হয়ত এও এক পরীক্ষা। ঘরে আর মন বসে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনে হৃদয়ের আকুল জিজ্ঞাসায় নীলাচলের পথে বেরিয়ে পড়ে শান্তির খোঁজে।

শত বাধা, ভয় সঙ্কুল অরণ্যের হাজারো বিঘ্ন মাড়িয়ে পথের ক্লান্তি ভুলে একদিন তারা পৌঁছে যায় নীলাচলে। সার্থক হয় পথ শ্রম। অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে ভরে উঠে মন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পবিত্র চত্বরে মাথা ছোঁয়ায় বার বার।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পায়, বার বার মানসচক্ষে দেখা সেই পরমপুরুষকে। তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন পবিত্র মন্দির চত্বরে। সেই কাঞ্চন বরণ তনু, চোখে ঝুরে অবিরাম ধারা। কণ্ঠে যার সুধা মাখা অভয়ের বাণী—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীচৈতন্যদেব এগিয়ে যান। প্রিয় মিলনের আবেগে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেন গঙ্গাধরকে। শরীরের স্নায়ূতে স্নায়ুতে অণু-পরমাণুতে মুহূর্তে খেলে যায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ। বিবশ দেহ লুটিয়ে পড়ে মহাপুরুষের পদপ্রান্তে। এক লহমায় সব হারিয়ে সবকিছু পাওয়া হয়ে যায় তার।

লক্ষ কোটি পূণ্যার্থীর পদরেণু পবিত্র নীলাচলের বুকে বৈষ্ণব সাধকদের আশ্রয়ে দিন অতিবাহিত হতে থাকে তাদের। গঙ্গাধর লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের প্রশ্ন তুলে ধরতে পারে না কোনদিন। মনের বাসনা মনেই থাকে। পার্থিব কামনা একি বলা যায়! কিন্তু বলতে হয় না কিছুই। যার কথায় মূক মুখে ভাষা ফোটে, যার কৃপায় পঙ্গু পর্বত অতিক্রম করে। সবকিছুই নিরবে তিনি শুনতে পান। কোন কিছুই তাঁর কাছে লুকানো থাকে না।

নীলাচলে থাকতে থাকতেই একদিন নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে লক্ষ্মীপ্রিয়া।

ধারা বিগলিত চোখে গঙ্গাধরকে ঘুম হতে তোলে—

—ওগো শুনছ। তিনি এসেছিলেন।

—কি বলছ তুমি! কে এসেছিলেন?

—ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব। যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব। আমায় মা—মা—বলে জড়িয়ে ধরে মিটি মিটি হাসি নিয়ে পরম তৃপ্তিতে আমার স্তন পান করে গেলেন। সে কি আলো, কি আনন্দ, কি রোমাঞ্চ তা আমি তোমায় বোঝাতে পারছি না গো।

চোখে জল আসে গঙ্গাধরের। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মনের ভেতরে তাকাতে সাহস নেই তার। মাথায় তার হাত বুলাতে বুলাতে বলেন,—সন্তান কামনায় তুমি কি পাগল হলে প্রিয়া।

—না, না; আমি পাগল হইনি। আমি সুস্থ স্বাভাবিক আছি। আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। এখন বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে। জান আমি স্পষ্ট দেখলুম মন্দির ছেড়ে আস্তে আস্তে জগন্নাথ দেব নেমে এসে ডাকলেন 'মা-মা! তুমি ডাকছিলে আমায়। কি করি বল, একটু দেরি হয়ে গেল।' তিনি দাঁড়ালেন। একই অঙ্গে কতরূপ। একবার জগন্নাথ, আরবার মহাপ্রভু। বার বার রূপ পরিবর্তন করে দেখালেন। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিবিড় আলিঙ্গনে বুকের 'পরে। যাওয়ার সময় বললেন, তুমি ঘরে ফিরে যাও মা। আমার প্রয়োজনেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। শ্রীচৈতন্যরূপী বিশুদ্ধ প্রেম, আমারই সত্ত্বা নিয়ে, অংশ নিয়ে তোমার গর্ভে জন্ম নেবে। তুমি ঘরে ফিরে যাও মা।

সব শোনেন গঙ্গাধর। দু'জনেই অভিভূত হয়ে পড়েন। এ যে ঐশ্বরীক, এ যে অলৌকিক।

প্রত্যুষের সামুদ্রিক বাতাসে ধ্রুবতারাকে সামনে রেখে প্রেমাস্পদকে প্রণাম জানান তাঁরা—

ত্বমেব মাতা, পিতা ত্বমেব;
ত্বমেব বন্ধু, সখা ত্বমেব;

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মমদেব দেব
জানামি ধর্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্য ধর্মং নচমে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন ;
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি !

মহাপুরুষের পদরেণু পবিত্র আমাদের এই দেশের মাটি এখানের সবুজ গাছ-গাছালিতে আছে ছায়া। আছে মায়া। এখানের মাটিতে গিরিকন্দর হতে নেমে আসা ঝরণার কুলু কুলু গীতে অনবরত ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টির আবাহনী আবেদন। আর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে মাধুর্য্য মণ্ডিত করতেই যেন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূল মালিক নানান রূপে যুগে যুগে নেমে এসেছেন ধরার ধুলোয়। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত জাতিবিদ্বেষে ক্ষত-বিক্ষত দিশেহারা মানুষের জন্য অভয়ের বাণী নিয়ে বার বার তিনি আবির্ভূত হয়েছেন— ভয় নেই, ওরে ভয় নেই—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্

* * *

পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামী যুগে যুগে ॥

কখনও তিনি এসেছেন রামচন্দ্র হয়ে, কখনও তার প্রকাশ দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। কখনও বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ আবার কখনও শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিবাস, রামকৃষ্ণ।

তাইতো জাতপাতের লৌহ কপাট খুলে বার বার তার উদাত্ত আহ্বান দুঃখী মানুষগুলোকে পথ দেখায়—

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ

কলি, ঘোর কলিকাল, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি, অনাচার, অবিচার, অসহিষ্ণুতা এই তো কলির পরিনাম। কালের ফলাফল তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে সমাজের বুকে। হাঁপিয়ে উঠছে মানুষ। আশা নেই, ভাষা নেই, ভরসা নেই। কোথা আলো, কোথা আলো। শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। অনাচারের স্রোতে, অধর্মের বন্যায় মানুষ ডুবছে আর উঠছে। উঠছে আর ডুবছে। অবিরত—অবিরাম। তবু তৃপ্তি আর আসছে না। আসবে কোথা হতে! স্বার্থের পোঁচ যে গরম পাঁচ; একেবারে চামড়া নিয়ে উঠবে। মানুষগুলো অহেতুক যেন ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি হাঁক্‌পাঁক করছে।

কে যেন তাদের ডেকে বলে—ওরে ডুবছিস কেন! ধর ধর! শক্ত হাতে ধরে ফেল, তাহলে আর জল খেয়ে ডুবে মরতে হবে না। কলি যুগে হরির নামই তো একমাত্র অবলম্বন। ধরতে পারলে ঠিক ভেসে থাকতে পারবি।

চিনতে পারে মানুষ যুগাবতার শ্রীচৈতন্য দেবকে। মোহান্ধ মানুষকে উদ্ধার করতে ঘরে ঘরে তিনি নাম বিলিয়ে ফিরছেন—

হরি নাম, হরি নাম, হরিনাম সার।
হরির নাম বিনা কলি যুগে গতি নাহি আর ॥

শোকার্ত মানুষ সান্ত্বনা পায়। বুঝতে পারে নামই মন্ত্র; নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর, নামই ধর্ম। নামই সব কিছুর সার। নীলাচল হতে বৃন্দাবন লক্ষ লক্ষ মানুষ মেতে উঠে। কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হয়—

গো কোটি দান, গ্রহণে চ কাশী;
মাঘে প্রয়াগে কোটি কল্পবাসী।
সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দান;
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নাম।

এই নামকে ধ্যান করতে করতেই যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল কৃষ্ণের জন্য রাধিকার বিশুদ্ধ প্রেম। এই বিশুদ্ধ প্রেম-ই শ্রীনিবাস।

আট

১৪৪১ শকাব্দ (ইং ১৫১৯, সন ৯২৬) বৈশাখ মাস। বৈশাখী পূর্ণিমার থালাভরা চাঁদ রূপালি ধারা গলিয়ে হাসছে। এই শুভদিনের শুভলগ্নে রোহিনী নক্ষত্রে চাকন্দি গ্রামে জন্ম নিলেন শ্রীনিবাস। মায়ের মুখে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটে উঠে। গঙ্গাধরের ঘরে বেজে উঠে শাঁখ। লক্ষ্মীপ্রিয়ার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়।

তৃপ্তি—তৃপ্তি—কি তৃপ্তি। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে প্রতিবেশিরা সদ্যোজাত এ শিশু যে কাঁদে না। ভূমিষ্ঠ হয়ে সব শিশুই তো অচেনা অজানা পৃথিবীর নতুন পরিবেশে কঁকিয়ে উঠে। এ ছেলে বোবা নাকি। ধাত্রীর কোলে শুধু মিটি মিটি হাসছে আর ইতি উতি চাইছে।

জন্মক্ষণেই নবজাতক সকলের নজর কাড়ে। বিশিষ্ঠতা নিয়ে যারা আসে তাদের জীবনে হামেশা এ জিনিষ দেখা যায়।

ছেলে বড় হচ্ছে। হাঁটছে, হাঁটি হাঁটি পা-পা। মায়ের কোল ছেড়ে শিশু নেমে পড়ে ধরার ধুলোয়। ধুলো মাখে। পুতুল গড়ে, খেলা করে। সব সময়েই আনন্দ। কাঁদতে তাকে কেউ দেখে না। আপন মনে কখনও হাসে। কখনও নাচে। কখনও সোহাগে মা লক্ষ্মীপ্রিয়ার গলা জড়িয়ে গোধূলির আকাশে ঝাঁক ঝাঁক উড্ডিন বলাকার দিকে তাকিয়ে বলে—মা, দেখো দেখো ; ওরা কেমন পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। ওরা কেমন কত গ্রাম, শহর, নগর, বন্দর পিছনে ফেলে ; কত পাহাড় নদী বন ছাড়িয়ে নতুন নতুন দেশে ভেসে চলেছে। ওরা কত স্বাধীন! কেমন মুক্ত! যেখানে যখন মন যেতে চায় সেখানেই ওরা যেতে পারে। ওদের বড় আনন্দ না-মা ?

লক্ষ্মীপ্রিয়া চুপ করে থাকেন। ছেলেটা বড় কল্পনাপ্রবণ।

—আমিও যদি ওদের মত একদিন পাখা মেলে উড়ে যাই তুমি আমায় বকবে না ?

মা হাঁসে—বোকা ছেলে! মানুষ কি কখনও উড়তে পারে। ওরা মুক্ত—বন্ধনহীন। ওদের পাখা আছে। তাই ওরা ভাসতে পারে।

—আমারও তো পা আছে। হাঁটতে পারি। দেখবে একদিন চলতে চলতে দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে আমি ঠিক জনারণ্যে হারিয়ে যাব।

কি স্বপ্নই না দেখতে পারে ছেলেটা। এক রত্তি ছেলের একি সাধ। মা অবাক হয়ে হাসতে হাসতে সস্নেহে চুমু এঁকে দেন তার কপোলে।

মায়ের কোলে কল্পনায় রঙিন শিশু একসময় কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

গঙ্গাধর আদর করে ছেলের নাম রেখেছে শ্রীনিবাস। ছেলে বড় হয়েছে। এবার চতুষ্পাটিতে তাকে ভর্ত্তি করা দরকার। মূর্খ ছেলের বাপ হয়ে বেঁচে থাকা আর অপুত্রক থাকা একই ব্যাপার। গঙ্গাধর এ ব্যাপারে সজাগ হয়। ছেলের শিক্ষা চাই। এবার তাকে শিক্ষিত করতে হবে। মানুষের মত মানুষ করতে হবে।

ছেলেকে তিনি নিয়ে আসেন চতুষ্পাটিতে। ধনঞ্জয় বাচস্পতি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। নামকরা অধ্যাপক। বয়সের ভারে পণ্ডিত মশায়ের দাঁতের সংখ্যা কমেছে। একগুচ্ছ শ্বেতশুভ্র শিখা ব্যতিত চুল কোথাও নজরে পড়ে না। দৃষ্টি শক্তি কিছুটা কমলেও স্মৃতি কমেনি এক রত্তি। পাণ্ডিত্যের তীক্ষ্ণ ফলা ঝকঝকে।

এক গাল হেসে তিনি গঙ্গাধরকে ডাকেন—আরে এসো এসো গঙ্গাধর, বসো। শ্রীনিবাসকেও সঙ্গে এনেছ দেখছি। ওকে কি ভর্ত্তি করবে নাকি।

গঙ্গাধর তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। শ্রীনিবাসও বাবাকে অনুসরণ করে। বিনীত নিবেদন রাখে—আজ্ঞে সে জন্যই তো আসা।

—ভাল, খুব ভাল। ছেলে মানুষেই ভাল। ভট্টাচার্য বামুনের ছেলে মূর্খ হলে তো চলবে না। অল্পবয়সে ছেলে থাকে মাটির তাল। যেমন গড়বে তেমনি হবে।

—সে জন্যেই তো আপনার কাছে নিয়ে এলাম পণ্ডিত মশায়, আপনি নিপুন কারিগর। মাটির তালে হাঁড়ি-সরাও হয় আবার অপরূপ শিল্প সম্ভারও বেরিয়ে আসে। যার যেমন হাত, হাতের গুণ। আপনি নিপুন কারিগর, আপনার হাত দিয়ে তো কখনও সাধারণ মৃৎ-পাত্র বেরুবে না।

—কি যে বল বাবা! কর্ম করতে হয় করি। নইলে আমরা কে? সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর আশীর্বাদ থাকলে সাধারণ অসাধারণ হয়ে যায় অবলিলায়।

সসম্ভ্রমে পুনরায় পণ্ডিত মশায়ের পায়ের ধুলো নেয় গঙ্গাধর। ভক্তি নম্র স্বরে বলে—শ্রীনিবাসকে আপনি আশীর্বাদ করুন। আপনি আশীর্বাদ করলেই হবে। আজ হতে আপনার হাতেই ওকে দিয়ে গেলাম।

চাকন্দি গ্রামের ধনঞ্জয় বাচস্পতির হাতে শ্রীনিবাসের শিক্ষার ভার দিয়ে চলে যান গঙ্গাধর।

পঠন পাঠন চলতে থাকে। দিন দিন ছাত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যত দেখতে থাকেন ততই অবাক হয়ে যান অধ্যাপক। অদ্ভুত মনঃসংযোগ। বিস্ময় জনক ধী-শক্তি। ছেলেটা শ্রুতিধর একবার যা শোনে তা' আর ভোলে না। কি মেধা! এমন ছাত্র তার সুদীর্ঘ জীবনে আর দুটি আসেনি। আসবেও না হয়ত কোনদিন। অখণ্ড মনযোগে অল্পদিনেই কিশোর ব্যাকরণ কোষ অলঙ্কার, কাব্য, দর্শন সব শাস্ত্র সত্তার সাথে মিশিয়ে নেয়। পণ্ডিত বুঝতে পারেন এছেলে সাধারণ নয়, অসাধারণ। ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজাত প্রতিভা নিয়েই এর জন্ম! এ যেন প্রতিভাধর আর এক নদের নিমাই। পণ্ডিত নিমাই। শিক্ষা তার অল্পসময়েই শেষ হয়ে যায়। অধ্যয়ন শেষ করে শিক্ষা গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফেরে শ্রীনিবাস।

শুরু হয় আর এক অধ্যায়। অস্তিত্বলীন অণুর উত্তপ্ত কামনায় অবচেতনায় যে বীজ উপ্ত হয়েছে একদিন, সেই বীজ এবার পত্রে-পুষ্পে শোভিত হয়ে পা ফেলে সুমধুর ফল প্রসবের আকাঙ্ক্ষায়।

দুই

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সাধারণত সাধন ভজন নিয়েই থাকেন। তিনি গৌর প্রেমের প্রেমিক। তবু ছেলের উপর তাঁর বড় টান। বাল্য-কৈশোরের অধ্যয়নের ফাঁকে শ্রীনিবাসকে তিনি শিখিয়েছেন—ভাল-বাসার মন্ত্র; আত্মনিবেদনের অভ্যাস। ধীরে ধীরে সযত্নে তুলি দিয়ে মনের ক্যানভাসে তার এঁকে দিয়েছেন ফলে ফুলে সাজানো এক ঐশী নন্দনকানন। মাঝে মাঝে সেই নন্দনকানন হতে ভেসে আসে অপার্থিব আহ্বান। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে শ্রীনিবাস। জীবন জিজ্ঞাসায় তোলপাড় করতে থাকে তার মন।

কোথায় সুখ; কোথায় শান্তি। কিভাবে সাধিত হবে জীবের মঙ্গল।

আনমনা শ্রীনিবাস একদিন ভাবতে ভাবতে চলেছেন মাতুলালয় যাজীগ্রামের উদ্দেশ্যে। আকস্মিকভাবে পথে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভজন লীলার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী নরহরি সরকার ঠাকুরের সাথে তার দেখা হয়ে যায়।

হাতে শূন্য পাত্র। তেল চকচকে শরীরে কাঁধে গামছা ফেলা, পায়ে খড়ম। ঋজু সচ্ছন্দ চলার গতি।

দেখেই চিনতে পারে শ্রীনিবাস। খসে পড়ে তার অপরিচিতের গুণ্ঠন। চঞ্চল মন নিয়ে প্রবল আত্ম জিজ্ঞাসায় লুটিয়ে পড়ে তাঁর পায়ে। তাঁকে বলে, আপনি পেয়েছেন সেই পরম পুরুষের সান্নিধ্য। আপনি ধন্য, আপনি পুণ্য, আমায় পথ নির্দেশ দিন।

সরকার ঠাকুর তার পরিচয় নিয়ে অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তাকে। বিস্ময় ঝরে তার কণ্ঠে—তুমিই শ্রীনিবাস।

সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে তাকে বলেন—আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। হেসে হেসে বলেন—

—কিন্তু শ্রীনিবাস আমি তোমায় কি নির্দেশ দেব? তুমি তো খাল ও নও, আর নালাও নয়। তুমি যে মহানদী। গৌড়বঙ্গ হতে ভারতের

বার

বিভিন্ন স্থানের ক্ষীণ ধারাগুলি একদিন তোমার বুকে লীণ হয়েই যে এগিয়ে চলবে সাগরের দিকে। তুমি শুনতে পাওনা সাগরের সে আহ্বান ?

সম্বিত ফিরে আসে শ্রীনিবাসের। বক্তব্যের ইঙ্গিত পরিষ্কার হয় মুহূর্তে। অবচেতন মন যেন চাবুক খেয়ে জেগে উঠে এক লহমায়।

মুখ দিয়ে তার জড়িত সংলাপ উচ্চারিত হয়—পেয়েছি, পেয়েছি। ঐ সে আমায় ডাকছে।

স্নেহময় পিতা আজ নেই। মহাপ্রয়ানের পথে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন। কাকে বলবে সে তার উপলব্ধির কথা। সময় আর কাটতে চায় না, মন আর মানে না। যে আকুতি যে ব্যাকুলতা তাকে অস্থির করে তুলেছিল প্রতিনিয়ত সেই আর্তিই তাকে ঘর থেকে বের করে এনে তোলে পথের ধুলোয়।

নীলাচল হতে ডাক দিয়েছেন যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্লোকে। তারই উদ্দেশ্যে পথ চলতে থাকে শ্রীনিবাস।

বর্ষাস্নাত যৌবনের ঢল ঢল ধারা তার বুকে। বিরহীর আর্তি ছেয়ে আছে সারা মন। সেই মন নিয়ে প্রিয় মিলনের বাসনায় সাগরের স্পর্শ নিতে চলেছে শ্রীনিবাস।

নীলাচলের পথ দীর্ঘ পথ। পথের বাধাও দুস্তর। তার উপর সারা যাত্রাপথ জুড়ে রয়েছে শাল, পিয়াল, ভুরুরু, মহুয়া নানান গাছের বিশাল অরণ্য। সেই অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে শাখায় শাখায় দোল খায় চিত্রিত ময়াল ; ফুঁসে বেড়ায় শঙ্খচুড়, বিষধর কালনাগিনী। অস্তিত্বরক্ষার লড়াই এ এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হায়েনা আর নিরীহ বন্য প্রাণীসমুহ অরণ্য তোলপাড় করে।

সেই পথ দিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে চলে শ্রীনিবাস। প্রিয়তমকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে শক্তি জোগায়। মিলনের উদগ্র বাসনা সব কিছু ভুলিয়ে দেয় তাকে। পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা, পথের বিপদ, শ্রমের ক্লান্তিতে ক্ষান্তির অবকাশ নেই।

তবু অনিয়মিত আহার অনিদ্রা মাঝে মাঝে দীর্ঘ যাত্রায় ঝিমুনি নিয়ে আসে। কিন্তু থামলেও তো চলবে না। কে যেন ভেতর হতে বলে—গতি চাই ; গতি চাই। মহাশূন্যের গতি। গতিবেগ বাড়ে।

দৃষ্টি যেখানে স্বচ্ছ। লক্ষ্য যেখানে স্থির। মন যেখানে একাত্ম গতি তো সেখানে অবারিত হবেই।

চলার পথে নীলাচল হতে ঘরে ফেরা তীর্থযাত্রী দলের সাথে তার এক একবার দেখা হয়। যুগাবতারের সংবাদ পায় তাদের কাছে। পুলকিত হয় মন। প্রিয় সান্নিধ্যের আর দেরি নেই। উড়িষ্যার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। আর দেরি নেই।

জয় জগন্নাথদেব। জয় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু একি! একি সংবাদ নিয়ে এল নবাগত দলটি।

মহাপ্রভু নেই—এ যে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি দীগন্ত বিস্তৃত নীল সাগরের ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন—এযে ভাবা যায় না।

তিনি বিশ্বনিয়ন্তা জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তিতে লীন হয়ে গেছেন—এ যে কল্পনাও করা যায় না।

বকসাদা মেঘমুক্ত আকাশ হতে এ সংবাদ যেন তার মাথায় বিদ্যুতের ঝলক হানে। মুহূর্তে সব আলো একসাথে নিভে যায় দুচোখ হতে। একটি কথাও বের হয় না মুখ দিয়ে। নেমে আসে হৃদয়ের নির্য্যাস গলানো শ্রাবণের ধারা। অণু-পরমাণুতে হাতুড়ি পিটতে থাকে। সারা দেহে পিন ফোটানো যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে চেতনা শক্তি লোপ পায় এক সময়।

সময় কত বহে যায় কে তার হিসেব রাখে! বিলুপ্ত চেতনার মাঝে শ্রীনিবাস অনুভব করে এক তাপ জুড়ানো কল্যাণকর স্পর্শ। আচ্ছন্ন অবস্থাতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই শোক ভুলানো ব্যথা-হরা মধুর মূর্তি। যে মূর্তি ধ্যান করতে করতে সে ফেলে এসেছে দীর্ঘপথ।

সে দেখে শিয়রে বসে আছেন পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যদেব

যন্ত্রণা কাতর মাথায় তিনি মায়ের স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে শ্রীনিবাস—

—প্রভু, একি স্বপ্ন না সত্য ?

মৃদু হেসে তিনি জবাব দেন, সত্য।

তবে যে ওরা আমাকে বলল—

—ওরা তোমাকে ভুল বলেনি শ্রীনিবাস। যা বলেছে তাতো অসত্য নয়।

—আমার যে সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

—অবুঝ হলে তো তোমার চলবে না। তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ। তুমি পণ্ডিত। তুমি জ্ঞানী। এতো জাগতিক নিয়ম। এ পৃথিবী পান্থশালা। জন্ম নিলেই মরতে হবে। শুধু আসা আর যাওয়া। যে কদিন থাকবে করে যেতে হবে। কল্যাণকর কাজের মধ্যে জীবন হয়ে উঠবে ধন্য, সার্থক। জীবন-সাধনার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে। গোষ্ঠি হতে সমষ্টির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সংসারীদের ধর্মের কাছি বেঁধে সংসারের পাঁক হতে টেনে তুলতে হবে।

—কিন্তু তা আর কেমন করে সম্ভব ? সব আশা যে মিছে হয়ে গেল। সব আলো যে নিভে গেল। জাত পাঁতের বেড়া ভেঙ্গে স্বার্থান্ধ ক্ষয়িষ্ণু গৃহীদের ঘরে ঘরে জীবনের ঐ মহান দর্শনকে কে আর পৌঁছে দেবে ? কেমন করে দেবে !

—কেন তুমি দেবে।

চমকে উঠে শ্রীনিবাস। আমি ! আমি দেব ! বিস্মিত প্রশ্ন তার

—আমার সে শক্তি কোথায় ?

—আছে ; তোমার মধ্যেই আছে। শোক তাপ মান অভিমান এখনো আমিত্বের যে সামান্য অংশটুকু তোমার মধ্যে টিকে রয়েছে তাকে বিসর্জন দাও তাহলেই তুমি খুঁজে পাবে নিজেকে। জেগে উঠবে আত্মশক্তি। দেখবে বিশ্বনিয়ন্তা ভর করেছে তোমার মধ্যে। আমি

—আমি ভাবছ কেন? সবই তো তিনি। সব প্রেমময়। সব একাকার। কারো কিছু নিজের সত্বা বলে নেই। সবই তোমার—সবই আমার—সবই তাঁর। নদী-নালা—খাল-বিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলধারা আবার ফিরে আসে সাগরে। সবই তাঁর অংশ। কর্মেই তাঁর প্রকাশ। জাগো শ্রীনিবাস। অনেক কাজ এখনো বাকি। এই তো শুরু। তোমার দাঁড়ালে চলবে না। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমার আরব্ধ কাজ তোমার মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পাবে। আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

—তবে তাই হোক প্রভু। আমার মধ্য দিয়েই তোমার মহিমা প্রকাশিত হোক।

চোখ মেলে তাকায় সে। ধুলো ঝেড়ে উঠে বসে। কেউ কোথাও নেই। মহাপুরুষ অন্তর্হিত। নির্জন প্রহর শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বিটপীর মিঠে ছায়ায় চেতনা ফিরে আসে। মনে তার জোর বাড়ে। সে এসেছিল। তাঁর নির্দেশ, তাঁর উপদেশই আজ জীবনের পাথেয়।

শুরু হয় আবার পথচলা। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠে ভগবানের মুখনিঃসৃত গীতার পবিত্র গীত—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মনাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।

তিন

পুরীর শ্রীমন্দির। মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায় শ্রীনিবাস। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, অধিষ্ঠিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রণত প্রণাম জানায়। লক্ষ কোটি পুণ্যার্থীর পদরজ ধন্য মন্দির প্রাঙ্গণের পবিত্র ধূলো গায়ে মেখে প্রবেশ মুখের পাশের সিঁড়িতে ক্লান্তিতে বসে পড়ে।

কেউ তাকে জানে না। কারুকে সে চেনে না। সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে। ধর্মপ্রাণ যাত্রীরা একে একে ফিরে গেছে নিজেদের পরিচিত আস্তানায়। পুরীর কোথায় কি কিছুই তার জানা নেই। বৈষ্ণব প্রভুদের ভজন কুটির কোথায় তাও তো সে জানে না। এখন যাবে কোথায়! রাত বাড়ছে ক্রমশঃ। নির্জ্জনতাও বাড়তে থাকে।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। খাওয়ার কথা মনেও হয়নি। সামনে ছিল একটি মাত্র চিন্তা, একটি মাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অনেক অপেক্ষার পর এখন সফল। অভুক্ত থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। অভুক্ত থাকা প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও এখন আর কষ্ট হয় না।

সেই অভুক্ত অবস্থাতেই ভাববিহ্বল কণ্ঠে মন্দির দ্বারের পাশে বসে বসে নাম গান শুরু করে দেয় সে।

কেউ তাকিয়ে দেখে না। কেউ খোঁজ নেয় না তার। নেবার দরকারই বা কার।

সকলেই তো এখানে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। পাণ্ডারা ব্যস্ত, তীর্থ যাত্রীরা ব্যস্ত।

মন্দির বন্ধ হওয়ার পূর্বপর্য্যন্ত মুঠোয় মুঠোয় নিজের স্বার্থের ঝুলিটা পূরণ করে সকলেই ফিরে গেছে যে যার নিজের নিজের আস্তানায়। মন্দির চত্বরে গৃহীরা বার বার মাথা ঠুকেছে—

—'ঠাকুর ধন দাও; মান দাও; ঐশ্বর্য্য দাও। সোনার কাঠি ছোঁয়া সুখের পালঙ্ক দাও।' পাণ্ডারা অনেকে দুহাতে টেনে লোভের

ঝুলিটা পুরিয়ে নিয়েছে। তাদের বাকচাতুর্য্য তো তাহা বিষয় মুখি। ভগবানকে কাছে পেয়েও কেউ কেউ চায় না। কেউ পায় না। লোভের গনগনে সূর্য্য তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

ভগবানকে কেউ ডাকার মত ডাকে না। ভগবান তো ভক্তের। ঠিক মত ডাক দিলেই ডাক শোনেন। ঠিকমত বাঁধতে জানলেই বাঁধা পড়েন। ভক্তের হাসির সঙ্গে তাকে হাসতে হয়। সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদতে হয়। অভুক্ত ভক্তের মুখে তুলে দিতে হয় ক্ষুধার অন্ন। না হলে যে তাকেও না খেয়ে থাকতে হবে।

তাইতো সেদিন কেউ খোঁজ না নিলেও মধ্যরাত্রিতে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় প্রভু জগন্নাথ দেবকে শ্রীনিবাসের খোঁজে।

গভীর নিদ্রার মধ্যে শ্রীনিবাস পরিষ্কার ভাবে শুনতে পায় কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে—

শ্রীনিবাস—শ্রীনিবাস—

—কে আপনি ?

—সারা জীবন ধরে ডাকছিস্, আর আজ কাছে আসতে বলছিস— কে আপনি ? কেন তুই আমাকে চিনতে পারছিস না।

—কই নাতো, মনে তার খটকা লাগে। কিন্তু আমার নাম আপনি কি করে জানলেন।

—জানার চেষ্টা করলে কোন কিছু কি অজানা থাকে। সব জানা যায়।

এ যে আলোয় আলোময়! রাতের এই ঘন আঁধারে এত আলো কোথা থেকে এল। বিস্মিত জিজ্ঞাসায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু—

—না—না, কোন প্রশ্ন নয়; কোন কিন্তু নয়। এখানে অভুক্ত কারো থাকতে নেই। কেউ অভুক্ত থাকলে যে আমাকেও না খেয়ে থাকতে হবে। তুমি অভুক্ত। তোমার জন্যে খাবার এনেছি, খেয়ে নাও।

প্রতিটি কথায় তার মমতার স্পর্শ মাখা। কত যেন জানা, চেনা, আপন জন।

আঠারো

একটি কথাও বলতে পারে না সে। হাত পেতে সুগন্ধি মহাপ্রসাদ নিয়ে তৃপ্তির সাথে খেতে থাকে।

কিন্তু একি! সে কোথায় গেল। কোথায় পলকে অন্তর্হিত হল। তবে কি—তবে কি—

এবার বুঝতে পারে শ্রীনিবাস কে এসেছিল। ঘুমের রেশ তার চলে যায়। আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়।

মায়া—মায়া—সব মায়া।

চোখে জল আসে তার।

রাত পোহায় নি। গাছ-গাছালিতে তখনো ফিকে অন্ধকার। সামুদ্রিক গর্জন ভেসে আসছে নির্জন প্রহরে। ধুলিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে সে। শেষ রাত্রির সৌন্দর্য্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

এই সেই নীলাচল; যেখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব অন্ত্য-লীলার শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন।

বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়।

এক বুক বেদনা মাখা বাতাস দীর্ঘ হয়ে বেরিয়ে আসে ভেতর হতে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় তার সেই ঐশ্বরীক নির্দেশ, 'তুমি কেউ নও। এই সবে শুরু। এখনো অনেক কাজ বাকি। তোমার মধ্য দিয়েই আমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে।'

সচেতন শ্রীনিবাস এবার প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করে বেরিয়ে পড়ে শ্রদ্ধাষ্পদ বৈষ্ণব গুরুদের সন্ধানে।

একে একে দেখা হয় সকলের সঙ্গেই। সকলের আশীর্বাদ ও ভালবাসা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বৈষ্ণবতীর্থ পরিক্রমায়। দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় হরিদাস ঠাকুরের ভজনক্ষেত্রের সিদ্ধ বকুলবৃক্ষ; তাঁর পবিত্র সমাধি; স্বরূপ দামোদরের ভজনকুটির। দেখা হয় তার বৈষ্ণব সাধক সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য, শিখি মাইতি, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মহাপ্রভুর সাধন সঙ্গীদের সাথে। তাদের ভালবাসা তাকে অভিভূত করে।

গদাধর প্রভু তাকে গোপীনাথজীউ এর মন্দিরে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, তুমি এলে ; বড় দেরী করলে যে ভাই। তোমার প্রতীক্ষাতেই আমি বসে আছি।

সে কি! তবে কি তার আশার কথা তিনি জানতেন। হয়তো তাই।

এ আর অবাক হবার মতো কি! মহাপুরুষদের চলার পথে অলৌকিক কত রহস্যই তো লুকিয়ে রয়েছে।

চেয়ে চেয়ে কুল পায় না সে। সামুদ্রিক গভীরতা এক এক সময় কত অচঞ্চল নিস্তরঙ্গ হয় গদাধর প্রভুকে না দেখলে বোঝা যায় না।

এই সেই গদাধর যাঁর মধ্যে বিকসিত হয়েছে মধুর রস। রতির পূর্ণ প্রকাশ। ইনিই তো শ্রীরাধিকার বিভূতি স্বরূপ।

"রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরাস্থিতা
সাত্তগৌরাঙ্গ নিকটে দাম বংশো গদাধর।"

গদাধর যেন অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের খনি। জ্ঞানের খোয়া পেটানো রতি আর রসের প্রশস্ত রাজপথ ধরে যতই গভীরে যাও ; শেষ নেই—শেষ নেই।

শাস্ত্রজ্ঞ সাধক গদাধরের শিক্ষায় সঞ্চয় বাড়ে তার!

সূর্য্য উঠে। সূর্য্য ডোবে ঘনান্ধকার আকাশে ফিকে আলো নিয়ে হাসতে থাকে, সারি সারি নক্ষত্র। দিনের কোলে দিন, রাতের কোলে রাত গড়িয়ে যায়। গদাধর প্রভু একদিন অলস সায়াহ্নে ডাকেন তাকে—শ্রীনিবাস।

—আদেশ করুন।

—অনেকদিন তো হল। এখানের কাজ শেষ। এবার যে নোঙর তুলতে হবে।

বুঝতে পারেন না শ্রীনিবাস। মাঝে মাঝে তিনি এমন অনেক হেঁয়ালি মাখা কথা বলেন।

শ্রীনিবাস চেয়ে থাকে। হেঁয়ালির ধাঁধাঁ তার চোখে। কি বুঝতে পারছেন না? না বোঝার কি আছে। হাসেন তিনি। তুমি বৃন্দাবন

যাও। শ্রীজীবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ নাও। এখনো অনেক জানার আছে। সেইখানেই পাবে পথ নির্দেশ, আসবে তোমার পূর্ণতা। ঘটবে প্রকাশ।

নির্দেশ শুনে বর্ষা নেমে আসে দু' নয়নে। ছেড়ে যাওয়ার বেদনা কালো মেঘ আর ঝড়ো হাওয়ায় ছেয়ে দেয় তার মন তারই ফাঁকে এক একবার আলোর ঝিলকি আসে। বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন, শ্রীজীব—গোপালভট্ট—ভাবি মিলনের উৎফুল্লতা নাড়া দেয় তাকে।

এ যেন একদিকে বিরহের দীর্ঘশ্বাস আর একদিকে মিলনের হাতছানি! বিরহের বেদনাবুকে মিলনের আর্তি। নির্দেশ মাথায় করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পথে নেমে পড়ে শ্রীনিবাস। শুরু হয় আবার পথ চলা।

চলতি পথে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সুরে সুর মিলিয়ে শ্রীরাধিকার জ্বালা ও আর্তি নিয়ে কে যেন তার মর্মলোকে গেয়ে উঠে—

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইব জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

চার

'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়' কাথাটা কে যেন বলেছিল, ছোট্ট কথা। কিন্তু কথা সত্য। কত সুন্দর করে বলা।

ভগীরথের মতো আগে আগে শাঁখ বাজিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে নদের নিমাই। পিছনে পিছনে খোল করতালের মূর্ছনায় পূত সলিলা মন্দাকিনীর স্রোতধারা রিপুর আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে। এক নতুন ভাব তরঙ্গ। ভাবের বন্যা। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মান অভিমান, রাজ অহংকার, কুল, জাত কুসংস্কারের আগাছা। সিঞ্চিত করেছে হৃদয়ের মলিনতা। গৃহী হতে যোগী, রাজা হতে ফকির সব মানুষের ভার তুলে নিয়ে তর তরিয়ে ভেসে চলেছে হরি নামের তরী। শান্তিপুর—নদে—নীলাচল—বৃন্দাবন—দেশের পর দেশ ছাপিয়ে যুগান্তরের গতিবেগ। কাণ্ডারী শ্রীনিবাসের ছোট্ট নৌকাও পাল তুলেছে বৃন্দাবনের পথে। চলতিপথে যাজিগ্রামে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে বৃন্দাবনের প্রান্তদেশে সে পৌঁছে যায়। কিন্তু এক দুঃসংবাদ তার জন্য এখানে অপেক্ষা করে থাকে।

রূপ সনাতন নেই। তাঁরা মানবলীলা সংবরণ করেছেন। শুনে পাথর হয়ে যায় শ্রীনিবাস।

নিজের উপর বিতৃষ্ণা আসে তার। ভাবতে থাকে একি ভাগ্যের পরিহাস। অল্প কয়েক দিনের জন্য মহাপ্রভুর সাথে দেখা হল না। তিনি দেহ রাখলেন। ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়ে গদাধর প্রভু চিরদিনের জন্য সরে গেলেন। রূপ সনাতন প্রভুও হারিয়ে গেলেন। একবার চোখের দেখাও দেখা হল না।

বার বার তার মনে হয় বেঁচে থাকা তার অর্থহীন। কিন্তু আত্মহত্যা সেও তো পাপ।

কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারে না সে। ভাঙা মন নিয়ে শ্লথ দেহকে টানতে টানতে গোবিন্দজীউ-এর মন্দিরে এসে মাথা ঠুকতে থাকে বার বার—একি করলে প্রভু, একি করলে—

বাইশ

বৃন্দাবনে গোবিন্দ জীউ-এর মন্দির। লোকজন সব সময় গমগম করছে। নিত্যকার মত কাতারে কাতারে মানুষ আসছে, পূজা দিচ্ছে। বিগ্রহের নয়ন ভোলানো রূপে হৃদয় ভরে ফিরে যাচ্ছে পায়ে পায়ে। আসা যাওয়ার শেষ নেই।

শ্রীনিবাস ধীর পায়ে উঠে আসে মন্দির চত্বরে। সুঠাম মূর্তির ভুবন ভোলানো রূপ এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে এক সময় লুটিয়ে পড়ে।

আরে, আরে, কি হলো! লোকটা পড়ে গেল যে? ভূলুণ্ঠিত মানুষটির কাছে ছুটে আসে সেবাইতের দল। মনঃসংযোগ করে সমবেত যাত্রীর।

তাইতো লোকটা যে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওরে জল নিয়ে আয়। পাখা নিয়ে আয়। বাতাস কর।

বিরক্ত হয় কেউ কেউ। মন্তব্য করে যত সব হাড় হাভাতে দল। যা না বাবা, মরতে যদি হয় রাস্তায় গিয়ে মর। মন্দিরে কেন?

বাতাস করতে করতে জ্ঞান একটু একটু করে ফিরতে থাকে লোকটার।

পাশ ফিরে শোয়। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। চোখের কোণে জল শুকিয়ে কালো ছোপ। মুখের চেহারা দেখে ভদ্রঘরের মনে হচ্ছে। কাঁধে উপবীত, তাহলে ব্রাহ্মণ!

ভিড় একটু সরিয়ে প্রধান সেবাইত প্রশ্ন করে কে তুমি, কোথায় তোমার বাড়ী?

কোন উত্তর নেই।

যা মলো যা। উত্তর করে না দেখো।

—আরে বলবে তো কোথা হতে আসা হচ্ছে। কোথায় কার কাছে উঠেছ?

কথাগুলো যেন কানে যায়। জড়িত কণ্ঠে উত্তর দেয় অজানা পথিক; গৌড় বাংলা থেকে আসছি।

কোথা হতে! গৌড় হতে! সে তো অনেক দূর।

নিরীক্ষণ করে বলে তার জন্যই বোধ হয় এমন হয়েছে। পথতো আর কম নয়।

কথা শেষ করতে দেয় না। উত্তর করে আগন্তুক—না না, সেজন্য নয়। দূর দুর্গম পথের জন্য আমার কোন ক্লান্তি নেই। কোন ক্লেশ নেই। শরীর আমাকে একটুও কাবু করতে পারেনি। আমার—আমার—

—থাক, এখন আর কথা নয়। কার কাছে তুমি যেতে চাও বল আমরা তাকে খবর পাঠাচ্ছি। না হয় আমাদের কেউ সেখানে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ছল ছল চোখের কোণ হতে বিন্দু বিন্দু মুক্তাধারা গণ্ডবেয়ে গড়িয়ে পড়ে। কোথায় যাব। কার কাছে যাব। কেমন করে এ মুখ নিয়ে সে ঠিকানায় দাঁড়াব। আমি যে বড় অলুক্ষণে ভাই। যাকে, যখনই আমি ভালবেসেছি, নিবিড় করে ধরতে গেছি তখনই সে মায়া মৃগের ছলনায় সরে গেছে কাছ হতে। আমি আর কাউকে এ দুর্ভাগ্যের সাথে জড়াবো না। জড়াতে চাই না।

একটা দমফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক হতে।

হায় রূপ—হায় সনাতন—একি করলে প্রভু!

কোন্ অপরাধে তোমাদের মধুর সঙ্গ হতে বঞ্চিত করলে কাছে আসছি জেনে ত চিরদিনের জন্য চলে গেলে। কিছুদিন; শুধু কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারলে না। হায় রূপ—হায় সনাতন—একি করলে প্রভু! হু—হু—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আগন্তুক। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো বৈষ্ণব সাধক শ্রীজীব গোস্বামীর কানে আসে সেই বিলাপের সুর। রূপ সনাতনের জন্য মর্মস্পর্শী ব্যথায় এমন করে কাঁদছে কে! কে এই আগন্তুক।

এগিয়ে যান তিনি। ভিড় সরে যায় দু'পাশে।

প্রশ্ন করেন—কে তুমি?

শান্ত স্নিগ্ধ মমতা মাখানো প্রশ্নে মুখতুলে সে।

ছোট্ট উত্তর বেরিয়ে আসে—আমি শ্রীনিবাস।

শ্রীনিবাস তুমি ? তুমিই শ্রীনিবাস !

নয়নে নয়ন আটকে যায় অন্তর্ভেদি দৃষ্টির মধ্যে মুহূর্তে গড়ে উঠে পরিচয়। যে পরিচয় দেশ-কাল-পাত্র, রক্তের কোন ধার ধারে না। দুই পুরুষের মিলনে সার্থক হয় একটি দিন। সাক্ষী থাকে মহাকাল।

শ্রীনিবাসকে বুকে জড়িয়ে শ্রীজীব বলেন —চোখের জল মুছে ফেল ভাই। বুক বাঁধ। দুঃখের মাঝে, শোকের মধ্যে, বিরহের মধ্যে, ব্যথার মাঝে সবখানেই যে তিনি রয়েছেন। সেখান হতেই তাঁর স্পর্শ নিতে হবে। সুখ মনে করলেই সুখ। দুখ মনে করলেই দুখ। সবই তো মনের ব্যাপার। মনের মধ্যে মন্দির তৈরী কর দেখবে কোন অনুভূতি নেই। রূপ-রস-গন্ধ চেতনা সব একাকার। সব চৈতন্যময়।

চোখের জল তবু বাধা মানে না তার। মমতায় প্রিয়জনের ভালবাসায় তা দ্বিগুন হয়ে দেখা দেয়। সান্ত্বনা দেন শ্রীজীব—ছিঃ কাঁদেনা। রূপ-সনাতন প্রভু তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে তাঁরাও যে দুঃখ পাবেন।' তুমি কি অবুঝ ? তুমি কি জাননা—এ পৃথিবী পান্থশালা। রাত ফুরুলেই পথ দেখতে হবে। কাজ শেষ হলে সকলকেই তো একদিন যেতে হবে। হরির নাম গান গাও ভাই। নামের মধ্যেই তো ওঁরা মিশে আছেন। দেহটা গেছে তো কি হয়েছে। আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার কি মৃত্যু আছে। ভগবান নিজেই তো বলেছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরানি
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী

দেহ তো জীর্ণ কাপড়। একটা ছাড়ে। একটা ধরে। যুগ যুগ ধরে আত্মা খেয়া বেয়ে যায় কর্মের মধ্যে, ক্রিয়াকর্মের আচার আচরণে আসে জ্ঞান। জ্ঞানের আলোতে দেখা যায় ভক্তি। আর ঐ ভক্তি দিয়েই তো পৌছতে হবে মুক্তির লক্ষ্যে।

মায়াচ্ছন্ন মানুষকে দেখাতে হবে সেই পথ। চলো, ছুটিয়ে চলো।

শ্রীজীবের পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় শ্রীনিবাস।

পাঁচ

ভজন সাধন আরাধনায় ও পঠন পাঠনে দিন ফুরিয়ে মাস গড়ায়। মাস ফুরিয়ে বছর। বছর বাড়তে থাকে যুগের কোলে।

শ্রীজীব অধ্যাপক—ছাত্র শ্রীনিবাস।

আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের সান্নিধ্যে পঠন পাঠনে বেশ কাটতে থাকে দিনগুলো।

একে একে শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জলনী, নমনী মথুরামাহাত্ম্য হংসদূত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যত্নের সাথে শিক্ষা নেন তিনি।

অদ্ভুত প্রতিভা শ্রীনিবাসের। শ্রীজীব গোস্বামী যত দেখেন ততই অবাক হন। অবিস্মরণীয় একটি ছাত্র। তার ভবিষ্যৎ ভেবে গর্বে ফুলে উঠে তাঁর বুক। বহুদিন পর শেষ লগ্নে যোগ্য আধার তিনি খুঁজে পেয়েছেন। বৈষ্ণব তত্ত্বের জটিল গ্রন্থ সমূহ অনুধাবন করতেও একটু সময় লাগে না। একে দিয়েই হয়তো দূরতম প্রান্তের অন্ধকার বিদূরিত হবে একদিন। এ যেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে' স্রষ্টার আর এক প্রকাশ।

আগাম কর্ত্তব্য স্থির করেন তিনি। কিন্তু তার আগে একবার পরীক্ষা নেওয়া দরকার। একদিন পরীক্ষার ছলে তিনি বলেন—শ্রীনিবাস। শ্রীরূপ প্রভুর 'নীলমণি' গ্রন্থের একটি শ্লোক নিয়ে বড় দোটানায় পড়েছি আমি। অনেকেই ব্যাখ্যা করেছে। কোনটাই ঠিক মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। এ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে তুমি শোনাও তো।

শ্লোকটি তিনি আবৃত্তি করেন—

'সখি রোপিত দ্বিপত্র শত পত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারী
সোহয়ং কদম্বভিস্তু: ফুল্লোবল্লভ বধূস্তদতি।'

মৃদু মৃদু হাসে শ্রীনিবাস।

ছাব্বিশ

বলে—প্রভু! এ আপনার কি পরীক্ষা। একনদী জল কি কখনও সীমাহীন সমুদ্রের পিয়াস মেটাতে পারে! তবু আপনি যখন আদেশ দিয়েছেন তখন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে আপনাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করব। ব্যাখ্যা করতে বসে শ্রীনিবাস। অভিজ্ঞ ডুবুরির মত মণি-মুক্তার খোঁজে যেন অতলান্তে ডুব দেয়।

ঐশ্বরীক শক্তি যেন তার উপর ভর করে। সে বলতে শুরু করে—শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে অবস্থান করছেন। বিরহের জ্বালা তার বুকে। সেখানে নেই ব্রজের আকাশ, ব্রজের বাতাস, ব্রজের গাছপালা-প্রকৃতি, নেই ব্রজের গোপী, অপার্থিব প্রক্রিয়া প্রেমে মন তার সব সময় হু-হু করছে। কিন্তু এ মন আর বাধা মানে না। দূরত্ব অতিক্রম করে সে পৌঁছে যায় ব্রজে। শ্রীকৃষ্ণ সেই মন নিয়ে দেখেন ব্রজে তার দেখা আগের যা কিছু ছিল সব ঠিকঠাক রয়েছে। ঠিক রয়েছে বৃক্ষ গুলিও। তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তিনি নিজের হাতে যে গাছটি রোপণ করেছিলেন সেটি বড় হয়েছে। তাতে ফুল হয়েছে। ভ্রমর তাতে গুঞ্জন করছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই চিন্তার সাথে সাথে ব্রজে কিন্তু বাস্তব পরিবর্তন হয়ে যায়। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও তাঁর স্বহস্তরোপিত বৃক্ষটিতে ফুল ধরে ভ্রমর গুঞ্জন করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজ প্রকৃতির ভালবাসার এ এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ভালবাসা সেবা নিষ্ঠায় প্রকৃতিও যেন সমর্পিত হৃদয়। এ এক অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়, চিত্রের বর্ণনা।

সাধু, সাধু! শ্রীনিবাস। এ এক অনাস্বাদিত অদ্ভুত মর্মস্পর্শী তোমার ব্যাখ্যা। জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন শ্রীজীব গোস্বামী। —ধন্য ধন্য শ্রীনিবাস! সার্থক তোমার শ্রম! সার্থক তোমার শিক্ষা।

এরপর একদিন বৈষ্ণব কুলগুরুদের আহ্বান করে শ্রীজীব প্রভু আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে 'আচার্য্য ঠাকুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এখন হতে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর। জগতের 'আচার্য্য প্রভু' শ্রীনিবাস।

'আচার্য্য প্রভু' উপাধি তাঁর সর্বোত্তম সঠিক উপাধি। অলৌকিক সত্ত্বা নিয়ে যার জন্ম, জগতকে মুক্তির পারানি যোগাতে যাঁর আবির্ভাব, সংসারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থলোভ-পাপ-মোহ হতে গৃহীদের উদ্ধার করতে যাঁর ধরার ধুলোয় নেমে আসা; সর্বযুগের সব অবস্থার সেই লোকগুরুকে 'আচার্য্য ঠাকুর' বা 'আচার্য্য প্রভু' ছাড়া কোন নামেই আর ডাকা যায়? তিনি যে জন্মের পূর্ব হতেই জগতের আচার্য্য।

আচার্য্য প্রভুর শিক্ষা পর্ব শেষ হল। কিছু পূর্বে দীক্ষা পর্বও তাঁর সারা হয়ে গেছে।

মহাসাধক গোপাল ভট্ট প্রভু তাঁকে দিয়েছেন বীজ মন্ত্র। যন্ত্রের সাথে শিখিয়েছেন মন্ত্র পুরশ্চরন বিধি ও মধুর পরকিয়া রসের ভজন রহস্য।

তিনি উপদেশ দিয়েছেন—গোপীদের অনুগত পথে শ্রীরূপমঞ্জরীর যুথে বা দলে সখিদের প্রেমে কৃষ্ণ অনুরাগী হও। রতি রস হচ্ছে পবিত্র দেবালয় যেখানে অনুক্ষণ তিনি বাস করেন। রাগ অনুরাগ তার সিঁড়ি। হৃদয়ের ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে এক মন হলেই তাঁর দেখা মিলবে। আসবে সিদ্ধি।

গুরুর আশীর্বাদে গুরুমুখি সত্ত্বা তাঁর এখন সাবালক।

কেবলই ভাবেন ভয় কি আর। মর জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা পথ দেখিয়েছেন। এ পথ ভক্তির পথ। মুক্তির পথ। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার পথ। ঠিক তিনি এগিয়ে যেতে পারবেন।

সাক্ষাৎ দেবতাকে প্রণাম জানান তিনি ভক্তিভরে—

গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ
গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সারা মন তাঁর পূর্ণ হয়ে যায় রাগ অনুরাগে।

রতি—রস—রাগ—অনুরাগ।

আলোকের ঝর্ণাধারায় ভরে উঠে হৃদয়। টুকরো টুকরো হয়ে

বরফ গলাতে শুরু করে। পাহাড়ী ঝর্ণা জন্ম দেয় নদীর। নদী গান গেয়ে যায় মহানদীর বুকে। মহানদী চলতে থাকে সাগরের অভিসারে।

শ্রীনিবাস এখন পূর্ণ। তৃপ্ত। মাতোয়ারা। এমন সময় একদিন শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ডেকে বলেন—আমাদের বয়স হয়েছে। এখান ছেড়ে যাওয়ারও উপায় নেই। দেশে দেশান্তরে গৃহীদের দোরে দোরে নাম প্রচারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। গৌড় অনেক দূর, সেখান হতে শ্রম স্বীকার করে ক'জনই বা এখানে শিখতে আসতে পারবে। তার থাকতে:তুমি সেখানে যাও। বৈষ্ণব ভাণ্ডারের মণিমুক্তো গ্রন্থসম্ভারগুলি সঙ্গে নিয়ে যাও। বাংলার সরল জমিনে পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে দাও বৈষ্ণব ধর্মের মহামন্ত্র।

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে। বন্দরে বন্ধন কাল হল শেষ। শ্রীনিবাস বুঝতে পারেন শ্রীজীব প্রভুর নির্দেশ

যত বেদনাই বুকে বাজুক পরমারাধ্যের নির্দেশ মাথায় তুলে নেন তিনি।

আচার্য্য প্রভু এক মহান দায়িত্ব নিয়ে চলেছেন গৌড়ে। গোস্বামী প্রভুদের আশীর্বাদি মালা তাঁর গলায়। গুরুদেব গোপাল ভট্ট প্রভু দিয়েছেন "বংশীবদন" শালগ্রাম শীলা (যে শালগ্রাম রাধারমণ বিগ্রহের সাথে আজও তাঁর বংশধরেরা শ্রদ্ধার সাথে নিত্যপূজা করেন নাকাই-জুড়ি গোড়াশোল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রামে)

সঙ্গে তাঁর পদকর্তা নরোত্তম। সঙ্গী পরম বৈষ্ণব শ্যামানন্দ ও কয়েকজন রক্ষী।

আচার্য্য প্রভু বলেছিলেন—রক্ষী আমাদের প্রয়োজন নেই। রক্ষী কি হবে? পুঁথিপত্র তস্করদের কোন্ কাজে লাগবে? যার ধন সেই আগলাবে।

তবু দীর্ঘ পথের কথা ভেবে, নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে গোস্বামী প্রভুরা কয়েকজন রক্ষী দিয়েছিলেন সঙ্গে। পথের বিপদ বলা তো যায় না।

সঙ্গের গরুর গাড়ীতে কাঠের সিন্দুকভরা রয়েছে অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিত মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, মথুরামাহাত্ম্য হংসদূত, দানকেলিকৌমুদি, উদ্ধব সন্দেশ, বৈষ্ণব তোমিনী, হরিভক্তিবিলাস, গোবিন্দ লীলামৃত, ষঠসন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি।

ধুলো উড়িয়ে শব্দতুলে গোরুর গাড়ী চলেছে আগে আগে।

চোখের জলের আলপনা এঁকে নাম গান করতে করতে পিছন পিছন চলেছেন বৈষ্ণব বৈরাগীর দল।

ছয়

ধোঁয়া ছেড়ে বাঁকুড়া হতে কলকাতা আজকাল হামেশা ছুটে চলেছে দূর পাল্লার বাস।

বাঁকুড়ার প্রান্তে শ্রীশ্রী মা সারদামনীর স্মৃতিপূত জয়রামবাটি গ্রাম।

বাঁকুড়া হতে কিছুটা আগিয়ে ওন্দা পেরুলেই ইতিহাসখ্যাত মল্লরাজাদের কালজয়ী কীর্তিমন্দির শহর বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর ছাড়লেই কয়েক ষ্টপেজ পর বাস কণ্ডাক্টর হাঁক দেবে—কোতলপুর—কোতলপুর।

কয়েক মিনিট হলেও প্রত্যেক বাসকে এখানে থামতে হয় অল্পসময়। কোতলপুর ছোট্ট শহর। শহর না বলে বলে গ্রাম বললেই হয়তো ঠিক বলা হবে। নানান জাত। বিভিন্ন পেশা। অনেক মানুষের বাস। তার অধিকাংশই কৃষিজীবি। অভাব অনটনে এখন দিন কাটে। নিরুত্তাপ নিরুদ্বেগ জীবন। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন দেখা দিয়েছিল প্রচণ্ড উত্তাপ। আগ্নেয়গিরির লাভা। আর সেই লাভা বুকে নিয়েই এক শৌর্য্যময় অতীত ঘুমিয়ে আছে এখানে। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে একটি পুকুর খননের সময় প্রায় কোটি টাকার উর্দ্ধে

সোনার তাল, মোঘল আমলের পাত্র ও মূল্যবান হীরা-মুক্তা বেরিয়ে পড়ে। (সংবাদ আনন্দ বাজার পত্রিকা)

পাঠান বীর কতুলখাঁ তার দীপ্তিময় ইতিহাস বুকে নিয়ে শেষ ঘুম ঘুমুচ্ছেন এর সবুজ মাটির কফিনে। বীর কতুল খাঁ'এর নামেই বসতির নাম কোতুলপুর।

ভাবতে গেলেই মনের পর্দায় ভিড় করে মোগল সেনাপতি মানসিংহ জগৎসিংহ, জমিদার বীরেন্দ্রসিংহ, বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বির পাঠান নায়ক কতুলখাঁর অবিস্মরণীয় সংগ্রামের সাথে অনেক নাম, অনেক ধাম আর এক নদী রক্তের চিত্রিত কাহিনী। ঘুম ভেঙ্গে কথা বলে উঠে সুপ্ত ইতিহাস। মুখর হয় মৌন অতীত।

একদিন সেই কতুলখাঁর সাথে সাথে মল্লভূমের বুকে শেষ হয়ে যায় পাঠান স্বপ্ন। বিপদমুক্ত মোগল নায়ক মানসিংহ নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেন মহারাজ হাম্বির মল্লকে। প্রীতির রাখিতে লেখা হয় এক পৃথক ইতিহাস !

মোঘল বন্ধুত্বে গর্বিত বীর হাম্বির এরপর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন তাঁর বিষ্ণুপুরকে ঘিরে। বিষ্ণুপুর হবে প্রজাকল্যানকামী রাজ্য। বিষ্ণুপুর হবে ভারতের এক অনুকরনীয় আদর্শ রাষ্ট্র। সব ধর্মের সব জাতের সব মানুষের থাকবে সমান অধিকার। তাঁর রাজ্যে কোন প্রজার থাকবে না কোন দুঃখ, থাকবে না কষ্ট।

কিন্তু ভাবলেই তো সব হয়না। মহারাজ হাম্বির মল্ল জানেন চিন্তাকে কার্য্যে রূপায়িত করতে গেলে চাই খাঁটি মানুষ, সঠিক পরিকল্পনা, প্রভূত সম্পদ আর সবার উপরে দৈব আশীর্বাদ। মনের তাগিদে সে খোঁজেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

একদিন তিনি রাজ প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে রাজ্যের শুভাশুভ বিচারের জন্য রাজ জ্যোতিষি দেবনাথ বাচস্পতিকে ডেকে পাঠান। রাজ অভিপ্রায়ে গণনা করতে বসেন তিনি।

মাহারাজ হাম্বির মল্ল তন্ময় গম্ভীর।

একত্রিশ

নিঃশব্দে তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন বাচস্পতি ঠাকুরের কুঞ্চিত বলি রেখাগুলি।

দীর্ঘ সময় চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। কাজ চলেছে নিবিষ্ট মনে। হঠাৎ আর্কিমিডিসের আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠেন বাচস্পতি ঠাকুর—পেয়েছি পেয়েছি মহারাজ! পেয়েছি। রাজার মনে উদ্বেগ কি পেয়েছেন ঠাকুর।—বিষ্ণুপুরের প্রজাদের কল্যাণে যা একান্ত প্রয়োজন যে দৈবি সম্পদে বিষ্ণুপুর রাজবংশের নিশান কালের সীমানা ছাড়িয়ে পত পত করে উড়বে তারই সন্ধান গণনার মধ্যে আমি পেয়েছি।

মহারাজ হাম্বির মল্লের মনে একদিকে উদ্বেগ, একদিকে আনন্দ আর একদিকে সংশয়।

স্বপ্ন কি তবে সফল হবে। মনের মাধুরী মিশিয়ে বিষ্ণুপুরকে গড়ে তোলা যাবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি প্রজার ঘরে ঘরে কি সত্য সত্যই ফুটে উঠবে শরতের নির্মল হাসি।

তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। রাজ জ্যোতিষিকে বলেন আপনি আর একবার ভাল করে দেখুন। গণনায় কোথাও কোন ভুল নেই তো।—আপনি বলছেন কি মহারাজ আমার গণনায় ভুল হবে। আপনি কি আমার গণনায় আস্থা রাখতে পারছেন না। সন্দেহ প্রকাশ করছেন!

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনার পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, ভবিষ্যৎ গণনা নিখুঁত অব্যর্থ মানি। কথাটা ঠিক প্রশ্ন রেখে সেভাবে আমি বলিনি তবে—

—এর মধ্যে তবে-কিন্তু-যদি বলে কিছু নেই মহারাজ। জ্যোতিষ মিথ্যে নয় আর ধাপ্পাও নয়। যুগ যুগ ধরে গবেষণালব্ধ একটি পরীক্ষিত বিজ্ঞান। জন্ম-জয়া-মৃত্যু যদি সত্য হয়, সূর্য্য চন্দ্র তারা গ্রহ নক্ষত্র যদি ভ্রান্ত না হয় তবে আমি বলছি আপনি অবশ্যই পারবেন বিষ্ণুপুরকে স্বপ্নেরপুরী করতে। পারবেন হাজার হাজার প্রজাকে নিয়ে এই রাজ্যের মঙ্গল করতে। আমি আমার অভ্রান্ত গণনাতে দেখেছি মল্ল

রাজ্যকে গড়ে তুলতে যে বিপুল বৈভবের প্রয়োজন সেই বিপুল বৈভব আপনা হতেই তাড়া খাওয়া শশকের মত আপনার রাজ্যের সীমানার মধ্যে এসে গেছে। আপনি তা সংগ্রহ করুন। কাজে নেমে পড়ুন। সুফল আসবেই। গণনা কিছুতেই ভুল হতে পারে না।

রাজ জ্যোতিষির ভবিষ্যৎ বাণীতে গ্রামে গ্রামে, গহন অরণ্যে, মহল্লায় মহল্লায় চৌকি বসিয়ে দেন রাজা হাম্বির মল্ল।

খুঁজতে খুঁজতে একদল রাজ সৈন্য দেখতে পায় মালিয়াড়া গ্রামের পাশ দিয়ে গোপালপুর গ্রামের (বাঁকুড়া) প্রান্তে এসে থামল একটি মন্থর গরুর গাড়ী। গাড়ীটির সাথে রয়েছে কয়েকজন বৈষ্ণব বৈরাগী। গাড়ীর উপর রয়েছে একটি বিরাট কাঠের সিন্দুক। সিন্দুকটি সুরক্ষিত বলেই মনে হয় তাদের। মনে সন্দেহ জাগে সঙ্গে তো আর কিছুই নেই। তাহলে কি আছে ঐ বিশাল কাঠের বাক্সে।

লোকগুলির পরিধেয় মলিন। ক্লান্ত বলেও বোধ হয়। দেখে মনে হচ্ছে অনেক অনেক পথ দিনের পর দিন হাঁটা দিচ্ছে। তারা বুঝতে পারে আজকের রাত এখানেই কাটাবে এরা। খাওয়া দাওয়া আর রাতের বিশ্রামের জন্যই এই থামা। দূর হতে সব কিছু লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নিতে কোন অসুবিধা হয়না তাদের। বলা যায় না কার মধ্যে কি আছে। কি থাকে! কোথায় কি লুকানো আছে!

রাজ আদেশে অহরহ যা তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে তন্ন তন্ন করে হয়তো ঐ সিন্দুকের মধ্যেই মিলে যেতে পারে। সন্ধানে কোন ফাঁক ফোঁকর রাখলে চলবে না। হয়তো চিন্তার সামান্য ভুলে বিপুল বৈভব হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। শক্ত রশিতে সিদ্ধান্ত পাকা হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। একটি একটি করে নিভে যায় গ্রামের কেরোসিনের আলো। এখন নিশুতি রাত। ঘন জমাট। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। এলিয়ে পড়েছে ক্লান্ত বৈরাগীদের নিশীথ পাহারা। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরেছে তারা। যেভাবে হোক কাজ সারতেই হবে।

সরিসৃপের মত এবার নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বৈষ্ণবদের ঐ সিন্দুকভরা

সম্পত্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। লুঠ হয়ে যায় মল্লভূমের নিবিড় অরণ্য প্রান্তে বৈষ্ণব সাধকদের অমূল্য সম্পদ।

ঘুমচোখে সন্তানহারা মায়ের শোকে কাঁদতে থাকে নরোত্তম। কাঁদছে শ্যামানন্দ। বুক চাপড়ে পাগলের মত অবস্থা শ্রীনিবাসের। একটানা মর্মভেদী কান্নায় চোখ সকালের রক্ত জবার মত লাল।

মল্লভূমের প্রান্তরে সে কান্নার ঢেউ শুধু মাথা কুটে মরে। কেউ সাড়া দেয় না। কেউ সান্ত্বনা দেয় না। কেউ কোন আশ্বাস ও দিতে পারে না।

ভেঙ্গে পড়েন বৈষ্ণব গুরু আচার্য্য প্রভু। হতাশায় মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে আসে—কি আর রইল। সবই যখন গেছে কি হবে আর বেঁচে থেকে। এ অক্ষমতা আমার। এ দুর্বলতা আমার। হয়তো আমারই কোন পাপে এ সর্বনাশ ঘটে গেল। এ মুখ অমি আর কাউকে দেখাতে চাই না।

অবস্থা উপলদ্ধি করে নিজেদের চেপে রেখে তাঁকে সান্ত্বনা দেয় নরোত্তম।

প্রবোধ দেয় শ্যামানন্দ—আমরা কে? আমাদের ত্রুটি হবে কেন? সবই তো ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। হয়তো তাঁরই অভিপ্রায়ে এ অঘটন ঘটেছে। ধৈর্য্য ধরুন। গ্রন্থআমরা নিশ্চয়-ই ফিরে পাব।

কিন্তু সান্ত্বনার প্রলেপে যেন দাউ দাউ করে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠে রাবণের চিতা। দর দর আকাশ ভেঙ্গে গণ্ড বেয়ে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা। কোন কথাতেই মন মানে না।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বলেন—শ্যাম, নরোত্তম তোমরা ফিরে যাও। আমার জন্য ভেবো না। গ্রন্থগুলি ফিরে না পেলে এ জীবন আমি কিছুতেই রাখব না।

অনিচ্ছার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে বাধ্য হয় নরোত্তম। বিদায় নেয় শ্যামানন্দ। সাথীদের বিদায় দিয়ে ক্ষ্যাপা খুঁজতে থাকে পরশ পাথর।

বিষ্ণুপুর রাজ্যের গ্রামে গ্রামে ঘুরছে শ্রীনিবাস। প্রত্যেকটি গ্রামে

চৌত্রিশ

ছড়িয়ে আছে মল্লরাজাদের ঘাটোয়াল সৈন্য। কিন্তু কোন সাহায্যই তারা করছে না। কোন খোঁজই তারা দিচ্ছে না। তস্করদের সম্পর্কে সকলে চুপচাপ। মুখে যেন কুলুপ আঁটা। কেউ মুখ খুলছে না। তবু থামতে পারে না সে। থামলে তার চলবেও না। হাল ছাড়লে চলবে না। শোকে পাথর হয়ে পাগলের মত ঘুরছে দিনরাত।

ঘুরতে ঘুরতেই একদিন সে হাজির হয় বিষ্ণুপুর গড়ের উত্তর প্রান্ত সীমায়।

অনাহারে অনিদ্রায় গভীর বেদনায় শরীর অবসন্ন। দেহকে আর কিছুতেই মনের বাধ্য রাখা যাচ্ছে না। পা টলছে। শরীর এখন বিরাট বোঝা। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। আর পারা যায় না। ওইতো সামনে এক বিশাল বটগাছ। ঝুরির শাখা প্রশাখায় শীতল ছায়া বিছিয়ে যেন তাকে ডাকছে। এগিয়ে গিয়ে ছায়া সুশীতল বটগাছের স্নিগ্ধ কোলে আশ্রয় নেয় সে ক্লান্তিতে।

শতাব্দীর সাক্ষী এই নির্জন বটতলা আজকের সিদ্ধ 'বিশ্রামতলা'। সামনে তার কন্যা মহীয়সী হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ বিগ্রহের টেরাকোটা শিল্প ভূষিত মন্দির। অদূরে বহে চলেছে মহাকালের মূর্চ্ছনা তুলে ঝিরঝিরে কোচবিড়াই-এর জলধারা। কারো সেদিকে তাকাবার ফুরসত নেই এখন। কালের চাবুকে চুন বালি পাথর খসে পড়ছে মন্দিরের। অবহেলায় এ যেন যুগান্তের দীর্ঘশ্বাস।

এই বটতলা সেদিন ছিল বনঝোপে ঘেরা। না বসে কোন উপায় ছিল না বলেই কোনমতে বসা। এখানে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশে শ্রীনিবাসের সাথে পরিচয় হয় দেউলি গ্রামের কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর। সব শুনে প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে সে তাকে নিয়ে আসে নিজের বাড়ীতে। সেখানে ক্লান্তি অপনোদনের পর নিয়ে যায় রাজ দরবারে।

বিষ্ণুপুর রাজ দরবার। গড় পেরিয়েই প্রাসাদ। প্রাসাদ রক্ষা করছেন মল্লভূমের আরাধ্যা দেবী জগন্মাতা মৃন্ময়ী। দেখতে এগিয়ে চলছে শ্রীনিবাস। পশ্চিমের হলুদ সূর্য্যের মরা আলো ম্রিয়মান। প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। সবেমাত্র আরতি সহযোগে

দিনান্তের পূজা অর্চনা শেষ। শঙ্খ ঘণ্টার আওয়াজ থেমে যায় ধীরে ধীরে। মহারাজ হাম্বির মল্ল ভক্তিমথিত প্রণাম জানিয়ে এসে বসেছেন পাঠগৃহে। এ সময় নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ হয়। দীর্ঘ সময় চলে ধর্ম আলোচনা। পাঠগৃহ এখন জমজমাট অথচ নিস্তব্ধ যেন নির্জন। মাথার উপর আলো ছড়াচ্ছে বেশ কয়েকটা ঝাড় লণ্ঠন। সভায় যারা এসেছে সকলেই স্থির শান্ত চুপচাপ। পাঠ শুরু হয় যথানিয়মে। শ্রীমদ্ভাগবত হতে রাস পঞ্চধ্যায়ী অংশ পাঠ করছেন রাজপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্ত্তী। সভা তন্ময়।

কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সাথে নিঃশব্দে পিছনের সারিতে এসে বসে শ্রীনিবাস।

মহারাজ একবার মুখ তোলেন। ক্ষণিকের জন্য তাঁর দৃষ্টি ছুঁয়ে যায় নবাগতের প্রতি। সবার মধ্যে কে এই এককপুরুষ! অনেকের মধ্যে অনন্য বলেই তাঁর বোধ হয়।

পাঠকের অবশ্য কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু একি! একি পাঠ করছেন তিনি! এযে ভুল ব্যাখ্যা। নির্বাক শ্রীনিবাস শুধু মাথা নাড়ে। চোখে মুখে তার আপত্তি ফোটে। এভাবে বেশি সময় চুপ করে থাকা কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আত্মঅহমিকা নয় শেষ পর্যন্ত কর্ত্তব্য তাকে এই ভুল ব্যাখ্যায় আপত্তি জানতে প্ররোচিত করে।

বাধ্য হয়েই তিমি বিনীতভাবে রাজপণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—আপনি অনুগ্রহ করে শ্রীধর স্বামীপাদের বিচার বিশ্লেষণ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করুন। সেটিই হবে সঠিক।

পাঠ আচমকা থেমে যায়। রাজা বিস্মিত বিমূঢ়-কিছুটা বিরক্ত ও বীণা নিন্দিত মধুর কণ্ঠে একটা ধাক্কা খেয়ে সমস্ত সভা নড়েচড়ে বসে। সকলে অবাক চোখে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে কে এই দিব্য-কান্তি পুরুষ যিনি রাজ পণ্ডিতের ভুল ধরেন! কে এই মহাত্মা।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা পণ্ডিত থমথমে সারা সভাগৃহ এক পলকে একবার দেখে নেয়। তারপর নিজের আসনে দাঁড়িয়ে পিছনের নবাগত আগন্তুককে লক্ষ্য করে বলে—আপনি অহেতুক আমাকে

পাঠে বাধা দিয়ে অসম্মান করেছেন। এই অসম্মান সারা সভার অসম্মান। কিছুতেই তা মেনে নেওয়া যায় না। আপনি এই অধ্যায় হতে পাঠ করে প্রমাণ করুন। আপনার বক্তব্য ঠিক। আপনার পাঠে সভা সন্তুষ্ট না হলে মহারাজ আপনার বিচার করবেন। আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। আমি বিচার প্রার্থী। উত্তেজিত ব্রাহ্মণ এবার বসে পড়েন।

শ্রীনিবাস নির্বিকার। ব্রাহ্মণকে লঘু করার অথবা আঘাত করার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু বাস্তবে তাইতো কিছুটা ঘটে গেল। বৈষ্ণবীয় দীনতা তাকে গোধূলির সিঁদুরে রাঙা করে তোলে।

কিন্তু এছাড়া কি করার ছিল তার। ভুল ব্যাখ্যাকে সংশোধন করতে বলা যাবে না। জেনে শুনে অসত্যকে সত্য বলে মেনে নেবেন। শুধু নিজে শুনলেও না হয় নিরুত্তর থাকা যেত কিন্তু এযে বহু মানুষের চিন্তার ক্ষতি হয়ে যাবে।

লজ্জারাঙা নিরুত্তর শ্রীনিবাসকে সব কটি চোখ এখন গিলছে। এ অবস্থায় চুপ থাকা ঠিক নয়। সকলে যেন তাকে আশ্বাস দিচ্ছে—নির্দেশ দিচ্ছে—ভয় কি। তুমি পাঠ শুরু করো। শোনাও তোমার অশ্রুতপূর্ব হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা।

শুরু হয় মল্লরাজ সভার আচার্য্য শ্রীনিবাসের প্রথম শাস্ত্র পাঠ।

আহা! কি সাবলীল মনমাতানো প্রাণ জুড়ানো আলোচনা। আগে কেউ কোনদিন এমন ব্যাখ্যা শোনেনি। মন্ত্রমুগ্ধ নাগিনীর মত, নিগূঢ় তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সভা অভিভূত হয়। একবাক্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তারা। লজ্জিত রাজপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী অগাধ জ্ঞানের বিশাল সিংহ দরজায় শ্রদ্ধায় নত হয়।

মহারাজ হাম্বির মল্ল আসন ছেড়ে কাছে গিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানান। নিয়ে এসে পাশে পাশে বসান। ক্রমে আলোচনায় বুঝতে পারেন গোপালপুর সীমান্ত হতে ছিনিয়ে আনা সেই বিশাল গ্রন্থ সম্পদ কার। এগুলি রাজ্যের কোন কাজে লাগবে! এতো তিনি চাননি। তাই তা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ কামনা করেন।

সাইত্রিশ

শ্রীনিবাস দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেন—মনস্কামনা পূর্ণ হোক। ভারতে তোমার রাজ্য হয়ে উঠুক প্রজাকল্যাণকামী এক অনন্য অনুকরণীয় রাজ্য যে রাজ্যে ধর্ম হবে বর্ম, প্রজা হবে শক্তি আর রাজা হবে সেবক।

আশীর্বাদ তাঁর ব্যর্থ হয়নি। হিংসা, অসাধুতা, অসহিষ্ণুতা, জাতিবিদ্বেষ, প্রজাবিদ্রোহ, রাজ-অহমিকা আর কোনদিন ফণা তুলতে পারেনি মল্লভূমের বুকে।

এরপর একে একে মহারাজ হাম্বির মল্ল, মহারাণী সুলক্ষণা, যুবরাজ রাজপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সকলেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন তাঁর কাছে।

মল্লভূম হতে গৌড় ছাড়িয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দিব্য দ্যুতি।

তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই আদর্শে, ভাবধারায় গড়ে উঠতে শুরু করে কালের বক্ষে কালজয়ী সৃষ্টি টেরাকোটা শিল্পের মন্দির শহর বিষ্ণুপুর। তাঁর দেওয়া 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নাম নিয়ে ধন্য হয়, পূণ্য হয় বিষ্ণুপুর।

অহিংস সাধনায় আর যে প্রেমের প্লাবনে দিনে দিনে উত্তাল হয়ে উঠে মল্লরাজধানী সেই প্রেম আজও হাতছানি দেয় বিষ্ণুপুরের পথে প্রান্তরে।

কুটিরে কুটিরে অলিন্দে অলিন্দে কালাচাঁদ, মদনমোহন, রাধারমনের মন্দিরের পাষাণ চত্বরে আজও কান পাতলেই শোনা যায় অসংখ্য পদকর্ত্তার সাথে রাজবৈরাগী মল্লরাজ বীর হাম্বিরের ভক্তি অর্ঘ্য—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মন আশ
ভুঁয়া বিনা গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিঠ
ঘুচাইলে রাজ অহংকার।
করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন, সব ভেল উচাটন
এ সব তোমার ব্যবহার।

রাধাপদ সুধারাশী, সে পদে করিলা দাসী
গোরা পদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধিকাগণ সহ দেখাইলা কুঞ্জ গেহ
জাগাইলা তুই প্রেমরীত।
যমুনার কূলে যাই, তীরে সখি ধাওয়া ধায়
রাধা কানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীর হাম্বির হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে।

সাত

গঙ্গাধর গত হয়েছেন অনেকদিন। ছেলেটাও হয়েছে এক পাগল। সংসারের কোন মোহ নেই। সেই যে নীলাচল হতে ফিরে বৃন্দাবন গেছে তারপর আর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের মন বলে কথা। উদ্বেগ আশা এ নিয়ে দিন যেন কাটে না। মনে হয় এক একটি দিন এক একটি বছর।

ফজিগ্রামের নিভৃত পল্লীতে খড়ো ঘরের মেটে দাওয়ায় চোখের জলে বুক ভাসে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর। আনমনা মন মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ বলাকার উড্ডীন পাখায় পাখা নাড়ে। হৃদয় কন্দরে অপত্য স্নেহের মোমগলে টুপ্‌টাপ টুপ্‌টাপ।

ছেলেটা কোথায় আছে! কার কাছে আছে! খাওয়া দাওয়া নিয়মিত করছে কিনা? কেমন রইল? কখনই বা ফিরবে? এ প্রশ্ন বার বার ছায়া ফেলে যায় মায়ের স্নেহাবৃত দুধগোলা আকাশে।

গভীর বেদনায় নির্জন প্রহরে যখন একাকিত্ব ঘিরে ধরে তাকে, রাগ হয় তার গঙ্গাধরের উপর।

উঃ লোকটা কি স্বার্থপর! সব ভাবনা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে সরে পড়ল।

উনচল্লিশ

শত্রু ! সব শত্রু !

পেটের ছেলে সেও একবার ভাবলে না মায়ের কথা ! ভাবলে না একা ঘরে মায়ের কেমন করে দিন কাটবে। কার সাথে মনের তুটো কথা বলে হাল্কা হবে।

ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনার বড় সখ তাঁর। বড় সাধ তাঁর। সে সাধ তাঁর আজও মেটেনি। বাপের শেষ কাজ সেরে কিছুদিন পরই সে বেরিয়ে পড়ল পুরীর পথে। ফিরেই আবার বৃন্দাবন। পলাতক এমন ছেলেকে নিয়ে এভাবে কি কেউ বাঁচতে পারে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ভাবেন না আর নয়। এবার আসুক শ্রীনিবাস। এর ফয়সালা একটা করতে হবে। একা একা আর কিছুতেই নয়। এমনই নানান কল্পনা জাল বোনে তাঁর মাঝে।

কিন্তু ছেলে আছে আপন ভাবে। সবার মাঝে। সবার ভাবনায় এ ছেলেকে কি স্নেহের আঁচলে বেঁধে রাখতে পারেন লক্ষ্মীপ্রিয়া।

পারবেন কি করে ! নিবাস যার খোলা আকাশের তলে প্রকৃতির বুকে ; নিবাস যার সব মানুষের হৃদয় মন্দিরে তাকে কি কেউ চার দেওয়ালের লৌকিক আকাশে আটকে রাখতে পারে ?

মা হয়েও লক্ষ্মীপ্রিয়া তা পারেন নি। ছেলে তার আশীর্বাদ ঠিক আদায় করে নিয়ে অনেকদিন হল পাড়ি জমিয়েছে বৃন্দাবনের পথে।

বীরভূম—গয়া হয়ে হাঁটা তুর্গম পথ। খাওয়া বিশ্রামের কোন নিশ্চয়তা নেই। ভাবনা তো হবেই। তারপর আর কোন সংবাদ নেই আজঅব্দি। আশাপথ চেয়ে চেয়ে দিন কাটে। কখন ফিরবে শ্রীনিবাস। মায়ের মন মানা মানে না।

গঙ্গার তীরে তীরে স্নানার্থীদের কাছে কখনো বা পুণ্যার্থীদের কাছে খোঁজ খবর করেন—হ্যাঁগা ! তোমরা বৃন্দাবন হতে ঘরে ফেরা কোন যাত্রীর খোঁজ দিতে পার ? তোমরা কি কেউ বলতে পার বাছা আমার কেমন আছে। কখন তুখিনীর নয়ণের মণি ঘরে ফিরে আসবে।

অনেকে কান দেয় না। রোজ শোনা একই কথা, একই প্রশ্ন

এড়িয়ে যায় পাশ কাটিয়ে। সমবেদনায় কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—এ আর এক শচীমাতা।

চকিতে আনমনা লক্ষ্মীপ্রিয়া বলে উঠেন—না না, ওকথা বলো না। ওকথা বলো না গো! শ্রীনিবাস আমার নিমাই নয়। তাকে আমি সন্ন্যাসী হতে দেব না, আমি তার বিয়ে দেব বরণডালা সাজিয়ে লাল টুক্‌টুকে বউ আনব ঘরে। সে গৃহী হবে।

উজ্জ্বল আশায় তার চোখে জল এসে যায়। এদিকে মায়ের মন যত কাঁদে ছেলের পথ তত কমে। প্রবাসী ছেলের অন্তর হতে কে যেন নির্দেশ দেয় জননী জন্মভূমি ডাক দিয়েছে এবার পথে নাম শ্রীনিবাস।

শ্রীনিবাস ফিরে আসেন যাজিগ্রামে। বাড়ির উঠানে এসে ডাক দেন—মা! মাগো! ওমা কোথা গেলে?

কোন সাড়া শব্দ নেই। বাড়িটা নির্জন। যেন ভুতুড়ে বাড়ি। কেউ নেই যেন। শ্রীনিবাস দরজার খোলা পাল্লা দেখে বুঝতে পারেন মা ভেতরে। হয়তো শুনতে পাননি।

এবার আর একটু স্বর তুলে বলেন—বেশ রাগ করে যদি সাড়া না দেবে ফিরেই যাচ্ছি তাহলে। কানে যায় লক্ষ্মীপ্রিয়ার।

কে ডাকে! এ কার স্বর! এ ডাক শোনার জন্য কত রাত কত দিন কেটে গেছে তাঁর। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না লক্ষ্মীপ্রিয়া।

ভেতর বাড়ি হতে দাওয়ায় নেমে থমকে যান তিনি।

এই তো; এইতো তাঁর শ্রীনিবাস। কথা তাঁর জড়িয়ে যায়। চোখে মুখে ফুটে উঠে মাতৃস্নেহের দুরন্ত আবেগ; পরম প্রশান্তি।

মাকে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরেন শ্রীনিবাস।

—বারে, তুমি যে চুপ করে গেলে মা! আমাকে বকবে না? কিছু বলবে না!

—তুই এসেছিস এই তো আমার বলা শেষ। আর কি বলব। এবার তুই বলবি আমি শুনব। জানিস শ্রীনিবাস, আমি জানতাম যত দূরেই থাক তোকে ঠিক আসতেই হবে এবার।

একচল্লিশ

—আমি আসব তুমি জানতে ? কেমন করে জানলে মা ?

—কেমন করে আবার ? মায়ের মন বলে কথা। আজ কদিন ধরেই না আমার মন বড় বেশি কাঁদছিল। বলছিল—ভাবিসনে। দেরি নেই, ও ঠিক আসবে। ওরে ! ছেলেমেয়ে যত দূরেই থাক মায়ের মন যে সব সময় তাদের কাছে কাছে থাকে। ছায়ার মত জড়িয়ে ফিরে।

তা না হয় হল, আচ্ছা মা ! আমার জন্য তুমি এতো ভাব কেন বলো তো ? আমি কি আর ছোট্ট আছি ?

ছোট বড় কিরে ! ছেলে ছেলেই থাকে চিরদিন। ছেলেমেয়ে হোক তখন বুঝবি অপত্য স্নেহ কাকে বলে ?

মায়ের কথায় প্রাণখোলা হাসিতে এবার হেসে উঠেন শ্রীনিবাস।

—হাসছিস্ যে ? প্রশ্ন করেন লক্ষীপ্রিয়া।

—হাসবো না তুমি যে আমার ছেলেমেয়ের কথা বললে।

—কি হয়েছে তাতে। সংসারে বাস করতে গেলে ছেলেমেয়ে হবে না। আর না হলেই বা চলবে কেন ?

মায়ের মনের কথা জানেন শ্রীনিবাস।

মুচকি হাসেন—ছেলেমেয়েতো আমার রয়েছে মা ?

—কি যে বলিস। পাগলা কোথাকার।

—হ্যাঁ মা, ঐ সদর দরজার দিকে তাকাও। ঐ ত্যাখো মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুর হতে সাথে এসেছে ব্যাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণবল্লব ; সেখানে রয়েছে রাজা হাম্বির মল্ল, রানী সুলক্ষণা আর হাজার হাজার প্রজা। ওরাই তো আমার ছেলেমেয়ে। এই সব গৃহী শিশুদের মানুষ করতে করতেই যে আমার জীবন কেটে যাবে মা। আরো চাও।

নির্বাক লক্ষীপ্রিয়া বুঝতে পারেন না ছেলের এসব হেঁয়ালির কথা। কিন্তু তাঁর চাওয়াটা একদিন শেষ পর্য্যন্ত সত্য হয়।

তিনি দেখে যেতে না পারলেও শ্রীনিবাসকে বিধি নির্দেশে বিয়ে করতে হয়। ঐশ্বরীক অভিপ্রায় এড়ানো সম্ভব হয় না। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর স্বপ্নাদেশ, নরহরি সরকার ঠাকুরের নির্দেশ আর

বিয়াল্লিশ

সর্বোপরি মায়ের শেষ সাধ একমাত্র সাধ মেনে নেন তিনি। নবদিগন্তের বিচ্ছুরিত আলোতে আঁকা হয় এক নতুন জীবনের আলপনা।

বয়স একটু বেশি হয়েছে তাতে কি? সাধক বার্দ্ধক্য কোথা হতে আসবে। শক্তি মনের জ্যোতিতে বাঁধা। দিঘীর টলোমলো জলের ঘেরা গণ্ডিতে স্থির অচঞ্চল। বড় কথা মন। এই মন তার সব কিছু ছাড়িয়ে অহরহ কৃষ্ণ প্রেমের পারাবারে খেয়া বাইছে। আরোহী যদি কিছু বাড়ে মন্দ কি? সিদ্ধ জীবনে ক্ষতির ছোঁয়া লাগবে কোন পথে।

প্রথমবার তার ঘরে আসে যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে দ্রৌপদী। মল্লরাজের অনুরোধে গোপালপুর গ্রামের (বিষ্ণুপুরের সন্নিকট) পদ্মাবতী আসে দ্বিতীয়বার। দীক্ষার পর তাঁদের নাম হয় যথাক্রমে ঈশ্বরী ঠাকুরানী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া।

কালক্রমে ঈশ্বরী ঠাকুরানীর গর্ভে জন্ম নেয় বৃন্দাবন বল্লব ও রাধাকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভে আসে গতিগোবিন্দ নামে সন্তান।

তাঁদের চার কন্যা হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কাঞ্চনলতিকা ও যমুনা এর মধ্যে "মানবি বিলাস" (বাঁকুড়ার রাধানগর গ্রামে সদ্য আবিস্কৃত) গ্রন্থের রচয়িতা হেমলতা ঠাকুরানী পরম সাধিকা ছিলেন। বর্তমানে তাঁর বংশধরেরা যাজিগ্রাম, বিষ্ণুপুর, গোড়াশোল, নাকাইজুড়ি, কাঁকিলা, মাকড়কোল, হিরাপুর প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে বৈষ্ণব ধর্ম ও আচার্য্য প্রভুর ভাবধারা প্রচারে আজও ব্যস্ত। তাঁরা কেহ 'ঠাকুর গোস্বামী' কেহ 'ঠাকুর' আবার কেহ 'গোস্বামী' উপাধি ব্যবহার করেন।

দেশ বিদেশে নাম ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর। তিনি কখনও থাকছেন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের ছায়া ঘেরা বিশ্রামতলার সাধন কুটিরে, কখনো থাকছেন খেতুরীতে, কখনো কাঞ্চনগড়িয়া আবার কখনো থাকছেন বহু স্মৃতিবিজড়িত যাজিগ্রামের বাসভবনে।

তেতাল্লিশ

জ্ঞানের আলোয় আলোময় চারিদিক। শুধু নীলাচল নয় দেশের দুরদুরান্ত হ'তে ছুটে আসছে ছাত্রদল তাঁর কাছে অল্প সময়ের নবীন অধ্যাপকের কাছে তাঁরা খুঁজে পান শাস্ত্রের তাৎপর্য্যময় বাখ্যাগুলির সাথে হৃদয়ের যোগ। দিনে দিনে এক একটি লোহার টুকরো পরশ-মণির স্পর্শে সোনায় পরিণত হয় একদিন।

দলে দলে আসছে মানুষ। আসছে জ্ঞানী, গুণী, পরমার্থকামী সাধারণ মানুষ। আসছে রাজা, ফকির, রোগী, যোগী, ভোগী। আসছে তাপদগ্ধ সমস্যা পীড়িত গৃহী। লোকজনের ভিড় লেগেই আছে সব সময়।

একদিন এক গৃহী এসে তাঁকে ধরেন। বলে ঠাকুর সংসারের জ্বালায় যে জ্বলে মলুম এখন কি করি বলুন তো। কি করে শান্তি পাব। দিনরাত অমানুষিক খাটছি তবু অভাব আর মিটছে না। সংসারের মাঝ দরিয়ায় পাপের বোঝাতে নৌকো এখন তো ডুবু ডুবু শুধু নাভিঃশ্বাস উঠছে। তবু নেই আর নেই।

আচার্য্যপ্রভু স্মিত হেসে বলেন—দূর বোকা, অভাব কিসের। অভাব তো স্বভাবের। ধন দৌলত, টাকা কড়ি, সুন্দরী বৌ, ছেলে-মেয়ে সব পেলেই কি অভাব যায়। যায় না রে—যায় না। কিছু পেলেই আরো-আরো পেতে মন যাবে। স্থূল কামনা মনের পাপ। এ পাপ দূর করতে হবে। স্বভাব বদলালেই অভাব যাবে।

লোকটি অবাক চোখে তাকায়।

—তা আর হয় নাকি? স্বভাব কি বদলানো যায়।

—কেন যাবে না। কৃষ্ণ ভজনা কর তাহলেই যাবে। কৃষ্ণ প্রেমের দীঘিতে টপাটপ ডুব দে দেখবি সব জালা যন্ত্রণা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। স্পৃর্শকাতর ঠুনকো মন চিনির রসের মত ঘন হয়ে গেছে। তখন মণ্ডা মিঠাই যা বানাবি তাই হবে। লোকটি কেমন যেন হতাশ হয়। একি বলছেন আচার্য্যপ্রভু! তা কি করে হয়।

সে বলে—প্রভু আমি মূর্খ। শাস্ত্র পড়িনি। সাধন ভজন কেমন করে করব। সে তো এক জটিল পথ।

চুয়াল্লিশ

—কি বলছিস রে। এযে নদীতে না নেমেই একগলা। কে তোকে বলল সাধন ভজন করতে গেলে রাশি রাশি পুঁথি ঘাঁটতে হবে, এ পথ বড় জটিল পথ। শোন, কৃষ্ণ ভজনা ভাবের সাধনা। ভাব আর অনুরাগ থাকলেই হল। ভাব আসলেই অভাব চলে যাবে। ভবতারণের দেখা মিলবে। এইতো—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপুঃ তাহার প্রকাশ"

ঐ নররূপী নারায়ণকে হৃদয় মন একমুখি করে রাধার প্রেমে আঁকড়ে ধর। তা হলেই হবে। সাধনার পথে প্রেম ভক্ত হৃদয়ে সুখ দুঃখ রূপে ব্যঞ্জনা লাভ করে। সেই নিবেদিত অচঞ্চল অবিনশ্বর পরিণত প্রেমের নাম রাগ। লোকলজ্জা, কলঙ্ক, সুবিধা, অসুবিধা সব কিছু ভুলে গোপীদের আদর্শে আত্মনিবেদনের মধ্যে তার স্পর্শ পেতে হবে। পারবি না বদন ভরে তাঁকে ডাকতে।

—কিন্তু আমি যে সংসারী। উদয়াস্ত সাতপাঁচ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একা তো নই। পাঁচ দশটা হাত পেট আছে। সংসারের ঘানি টানব না ঐ সব করব।

—সবই করবি। সবই করতে হবে। সংসারে থেকে ফাঁকি দিলেতো চলবে না। যে রাঁধে সেকি চুল বাঁধে না? সংসারের কাজে নামগান করার বাধাটা কোথায়।

—কিন্তু—

—কিন্তু, যদি এসব আবার কি? তোকে তো মাথা মুড়াতে হচ্ছে না। কাপড় চাদর ছেড়ে গৈরিক পরে লোটা কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী হতে হচ্ছে না। ঘরে বসে দিনান্তের কাজ সেরে বিছানায় যাওয়ার আগে একমন হয়ে একটু সময় হরির নামগান করতে পারবি না?

—তা কেন পারব না। আপনি বলছেন ওতেই হবে। লোকটি বিস্মিত হয়।

—হবে রে হবে। ওতেই হবে। 'মরা' 'মরা' করতে করতে দেখবি ঠিক একদিন রামনাম বেরিয়ে আসবে। ঘষতে ঘষতে রত্নাকর

হয়ে যাবে মহাকবি বাল্মিকী। দেরি করিস নে! লেগে পড়। লেগে পড়।

আর কিছু না বলে তিনি ভেতর আশ্রমে চলে যান। শোক তাপদগ্ধ হাজার হাজার দুঃখী গৃহীর মত এই লোকটিও পেয়ে যায় প্রকৃত পথের হদিস।

সংসারের পাঁকে পাপড়ি মেলে তাকায় আর একটি পঙ্কজ।

আট

চিরকুমার নরোত্তমের বিষয় বাসনা নেই। সব কিছু ছেড়ে খেতুরীর এক প্রান্তে ভজন টুলিতে সে গড়ে তুলেছে সাধনপীঠ। রামচন্দ্র রয়েছে সাথে। ডাক পড়লেই শ্রীনিবাস ছুটে যান সেখানে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে কখনো ফিরে আসেন একা। আবার কখনো তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন যাজিগ্রামে। বিষ্ণুপুর, যাজিগ্রাম, খেতুরী এখন বৈষ্ণব তীর্থ।

নরোত্তমের উদ্যোগে দোলপূর্ণিমায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিনে এইতো কয়েকদিন আগে খেতুরীতে এক মহোৎসব হয়ে গেল। বৈষ্ণব সংস্কৃতির মেলা বসেছিল সেদিন। উদ্যোক্তা নরোত্তমের সাথে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু, রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ, ব্যাসাচার্য্য, গোবিন্দদাস, গোকুলানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সন্তোষ দত্ত তো ছিলেনই তাছাড়াও খড়দা হতে এসেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী মহিয়সী জাহ্নবীদেবী, অম্বিকা কালনা হতে হৃদয় চৈতন্যপ্রভু, শান্তিপুর হতে অদ্বৈতাচার্য্যের সন্তান অচ্যুতানন্দ, গোপালদাস প্রভু, বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন, রঘুনন্দন, লোচনানন্দ, প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুকুল।

নরোত্তমের বড় সাধ ছিল প্রিয়াজী সহ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার। মহাপ্রভু, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত,

রাধারমন, এই ছয় বিগ্রহের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই খেতুরীতে এ উৎসবের আয়োজন। অনেক দিনের সে সাধ পূর্ণ হয় তাঁর ঐদিন। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু অভিষেক, পূজাপাঠ সেরে শুরু করেন নাম সংকীর্তন। মেতে উঠে খেতুরী। আচার্য্য প্রভুর ভাবের বন্যায় নরোত্তমের পেলব পলিতে খেতুরী হতে ছড়িয়ে পড়ে পর্য্যাপ্ত সবুজ সম্ভার আগামীদিনের আশ্বাসে।

আচার্য্যপ্রভু এখন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি। নয়নের মণি। বৈষ্ণব ধারা, ঐতিহ্যে নিয়ে এসেছেন যৌবনের ঢল। পথভ্রষ্ট মানুষকে ডেকে ডেকে অমিয় সাগরে সিনান করাচ্ছেন। এখন তিনি সাময়িক যাজিগ্রামে রয়েছেন। যাজিগ্রামে যখন থাকেন ঈশ্বরী ঠাকুরানী সব সময় চোখে চোখে রাখেন তাঁকে। বরাবর তিনি দেখে আসছেন মানুষটা বড় আত্মভোলা, নিজের নিয়ে কোন ভাবনা নেই। আনমনে সব সময় কি নিয়ে যে ডুবে থাকেন বোঝা ভার।

যত্ন আত্তি না করলেও কিছু যায় আসে না তাঁর, সবেই সন্তুষ্ট।

সল্পে তুষ্ট মানুষটা সংসারের কোন খোঁজই রাখে না।

ভাবে ঈশ্বরী তো আছে। ঈশ্বরীর ভাঁড়ার কি খালি থাকে কখনো ; রামচন্দ্র, নরোত্তম, ঘরের লোক। তাদের কথা না হয় বাদ, এমন মানুষ যখন তখন অতিথি এনে ভরে দেবে সুবিধা অসুবিধা দূর অস্ত একবার বলবেও না মুখে কবে।

মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসেন জাহ্নবীদেবী, বীরচন্দ্র প্রভুর মত গুণগ্রাহী গুণীজন আর মহারাজ হাম্বির মল্ল, রানী সুলক্ষ্মণা, গোকুলানন্দ, শ্রীদাম, বংশী চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ দাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস বাবাজী, পদকর্তা সৈয়দ মূর্ত্তজা প্রভৃতি শিষ্য অনুরক্তের দল।

তাদের আপ্যায়ন, পরিচর্য্যা, দেখাশুনা সব কিছুর ভার ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর।

এমন উদাসান বেহিসেবি মানুষ খাওয়ার সময় হলেই একেবারে লোকজন সাথে নিয়ে এসে ডাক দেন, ঈশ্বরী ! আজ যে বড় ডাকলে না। দেখতো আলোচনায়, আলোচনায় কত দেরী হয়ে গেল।

দাও, দাও ; খেতে দাও। সব একসাথে বসে খাওয়া যাক। বড় খিদে পেয়েছে।

এ মানুষটি বরাবর এমনি ধারার। তা জানেন ঈশ্বরী ঠাকুরাণী। সে জন্য সব ব্যবস্থাই আগে হতে খোঁজ নিয়ে তাকে করে রাখতে হয়।

হেসে বলেন, রান্না অনেক আগেই তৈরী হয়ে গেছে। বসো তোমরা। তিনি এ নিয়ে কিছু কোনদিন বলেন না স্বামীকে। কিন্তু একটা জিনিষ কেমন কেমন ঠেকে তার। আচার্য্যপ্রভুকে একান্তে একদিন বলেন, একটা কথা তোমায় বলব কিছু মনে করবে না। ঈশ্বরী কি কথা বলতে চায় তাঁকে। একটু অবাক লাগে তাঁর। বলেন, সংকোচ কেন, বলো।

—দেখো তুমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, রামচন্দ্র বৈদ্য। তোমরা ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি খেতে বস। তাতেও না হয় কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি খেতে বসে ভালবেসে খাবার তুলে দাও রামচন্দ্রের এঁটো থালায়, ওর এঁটো ছুঁয়ে নিজেও খেয়ে যাও তৃপ্তি ভরে। এসব কি ? সমাজ সংস্কার জাতধর্ম বলে কিছু আছে তো। একি ভাল ?

এবার বুঝতে পারেন আচার্য্যপ্রভু। হেসে বলেন, মানুষের আবার আলাদা জাত কি ঈশ্বরী। আঁতুড়ে কি কেউ জাত নিয়ে আসে, না শ্মশানে জাত নিয়ে যায়। শেষের দিনে জাতের কি কোন পৃথক মূল্য থাকে।

বামুন কায়েত, বিদ্যি, বাগদী, আদিবাসী উপজাতি, মুসলমান এসব মানুষের সৃষ্টি। জাত হচ্ছে সংসারে সংস্কারের বেড়ি। এ বেড়ি না ভাঙ্গলে মানুষ এগুবে কি করে! জাতের বেড়া ভাঙতেই যে মহাপ্রভুর জন্ম। কুসংস্কারে অন্ধ মানুষকে বোঝাতে হবে 'চণ্ডালোপি দ্বিজো শ্রেষ্ঠ হরি ভক্তি পরায়ণঃ।' সবার মধ্যেই শ্রীহরি বিরাজ করছেন। ডেকে ডেকে তাকে জাগাতে হবে। সবাই যে আমার হরির লোক। হরিজন, হরিজন কি ভিন্ন হয় ? বৈষ্ণব কি পৃথক হয় ? তাছাড়া রামচন্দ্র, নরোত্তম আমার অংশ। তাদের সে চোখেই তুমি দেখো।

আটচল্লিশ

আর কথা বাড়ান না ঈশ্বরী ঠাকুরাণী। কথাগুলোর কিছু বোঝেন, কিছু বোঝেন না। কিন্তু কি সুন্দর কথা। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে তাঁর আরো। সব ব্রহ্মা, সব ব্রহ্মময়।

রামচন্দ্র আর শ্রীনিবাস, যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। যেন এ বলে আমায় দেখো, ও বলে আমায় দেখো, রামচন্দ্র গুরু ছাড়া কিছু বোঝেন না। শ্রীনিবাসের চিন্তা তার কাছে জ্ঞান। তার সব ভাবনা ঘিরে আছে শ্রীনিবাসের ভাব, শ্রীনিবাসের ভাষা তার একমাত্র বুলি। প্রভুর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। তার বেদ, উপনিষদ, ধ্যান, তার ধর্ম, কর্ম, মোক্ষ।

একদিন পায়চারি করতে করতে এক টুকরো দড়ির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে শ্রীনিবাস বলেন; দেখ, দেখ রাম কতবড় সাপ। রামচন্দ্র চমকে উঠে বলে; তাইতো কি বিরাট সাপ। মাটি মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমন্ত শিশুর মত কেমন ফণা গুটিয়ে পড়ে আছে কাল নাগিনী।

নড়ে না চড়ে না, সাপটা কি মৃত? রামচন্দ্রের চোখে মুখে বিস্ময়।

বিস্মিত শিষ্যের দিকে তাকিয়ে শ্রীনিবাস হাসেন।

বলেন দূর বোকা সাপ চিনিস না। সাপ কোথায়? ওটা তো দড়ি। হাতে নিয়ে পরখ করে দেখ।

রামচন্দ্র নেড়ে চেড়ে দেখে, তাইতো! এটা যে নির্জীব দড়ি! সাপ হবে কেমন করে!

ভাবে সাপ না দড়ি? কোনটা ঠিক? কোনটা কল্পনা, শ্রীনিবাস বলেন; জানিস রাম, মায়া, মায়া, সব মায়া। সংসারের মায়ার দড়ি এমনি বিষধর ভূজঙ্গ হয়ে ফণা তোলে। আবার গুরু মুখি মনের সামনে ঐ বিষফণা এক লহমায় নির্জীব দড়ি হয়ে যায়।

সংসারে থাকলে গুরু চাইরে। যে কাজই কর গুরু চাই। সৎ গুরু।

রামের আর ভাবনা কি? সে তো গুরু ছাড়া কিছু জানে না, বোঝে না। গুরু যা বলেন তা-ই করা চাই। ভালমন্দ ফলাফল সে গুরুর ভাবনা, সে ভাববে, অতশত নিয়ে মাথা ঘামায় না রাম। শ্রীনিবাস রামকে বলেন: তুই বিয়ে করেছিস বাবা। বাড়ীতে যুবতী

স্ত্রী, সংসারধর্মও ধর্ম। বড় ধর্মরে! রত্নমালা মা আমার একা একা বাড়ীতে রয়েছে। অনেকদিন তোকে না পেয়ে মনে তার কত কষ্ট হয় বলতো! যা যা একবার তার সাথে দেখা করে আয়।

অনুগত রামচন্দ্রের আর ভাবার দরকার পড়ে না। ছুটে যায় স্ত্রী রত্নমালার কাছে। বুকে টেনে নিয়ে বলে; মালা গুরুদেব বলেছিলেন তোমার মনে বড় কষ্ট হয়। তোমার মনে কষ্ট হলে আমিও যে কষ্ট পাব। গুরুদেব ব্যাথা পাবেন। ত্মাখো, তোমার মনের কথা জেনে ঠিক চলে এসেছি।

রত্নমালা হাসে। পত্নী সম্ভাষণেও গুরুদেব। মানুষটার চিন্তায় গুরুদেব ব্যতীত কিছু নেই। নিশীথ আলিঙ্গনে ভাবে, কত সরল। এ লোকের উপর কি রাগ করা যায়।

সবে একটি রাত। রাত না কাটতে কাটতে ভোরের ফিকে আলোয় গুরুগৃহে ফিরে আসে রামচন্দ্র, হাত মুখ ধোয়া হয়নি। রত্নমালার সিঁথির সিন্দুরে কপোল রাঙা খেয়াল নেই। চোখে মুখে রাতের ছাপ।

রাগে অগ্নিশর্মা চিরকুমার নরোত্তম ঝাঁটাপেটা করে তাকে ধিক্কার দেয়; তোমার কি বোধবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে একরাতে। বুনো মোষের মত কোন জ্ঞান নেই, লজ্জা সরম সব ঘুচিয়েছ, আশ্রমের শুচিতাটুকুও রাখবে না।

রামচন্দ্র সম্বিত ফিরে পেয়ে সরে যায় নিরবে। গুরুদেবের সামনে যেতে লজ্জা হয়। কোন অনুযোগ নেই তার।

শ্রীনিবাস একটু পরে নরোত্তমকে ডাকেন—নরোত্তম! স্নানের সময় হল, তেলটা দাও তো!

নরোত্তম অভ্যাস মত তেল মাখাতে গিয়ে দেখে রামচন্দ্রকে মারা প্রত্যেকটি ঝাঁটার আঘাত আচার্য্য প্রভুর পিঠে ফুটে উঠেছে।

অনুশোচনায় ভাবে যে হাত দিয়ে সে প্রভুকে আঘাত করেছে সে হাত আর রাখবে না। সে হাত পুড়িয়ে ফেলবে।

আচার্য্যপ্রভু আপন মনেই হেসে উঠেন। নরোত্তমের চিন্তায় ছেদ পড়ে। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে; প্রভু আপনি হাসছেন কেন?

—হাসবো না। দেখ পিঠ আমার, ঝাঁটা আমার, হাত ও আমার। তবু সব কেমন আমি ভাবছি। আমিত্বের বড়াই দেখে হাসবো না? শেষে দেখছি পুড়েই মরতে হবে।

নরোত্তম অবাক। ধরা পড়ে গেছে সে। মনের কথা অন্তর্যামী পরম পুরুষের কাছে কিছুই লুকানো গেল না। সত্য-ই তো সব সর্বময়ের অংশ। একি ভাবছিল সে, ক্ষমা চায় নরোত্তম।

আচার্য্যপ্রভু বলেন; হরি সব খানে আছে। গাছে পাতায়, জলে, আগুনে, রাজপ্রাসাদের স্তম্ভে, গরীবের কুঁড়েতে সর্বত্র। প্রহ্লাদের মত ভক্তির শাঁখ বাজিয়ে ডাকলেই তিনি হাঁক দেবেন। ভয় নেই, কাকে পোড়াবে! তোমার মধ্যে হরি আছে না? মন হতে আমিত্বের পোকাগুলো মেরে ফেল। পোকা লাগলে ভাল ফলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। পোকা মরলে তবে না হরি পূর্ণ ফল দেবে। যাও, কাজ করগে যাও।

স্নান করতে চলে যান তিনি। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে নরোত্তম গুণগুনিয়ে ওঠে—

হে গোবিন্দ গোপীনাথ
কৃপা করি রাখ নিজ পথে
কাম ক্রোধ ছয় গুনে লৈয়া ফিরে নানাস্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোরে গলায় বান্ধিয়া।

দৈব্যমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব কূপে দিলে ভেলাইয়া ॥
পুনযদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তোলহ ব্রজ ভূমে।
তবে সে দেখিয়া ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

যুগ যুগ ধরে এই ভারতের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন কত সাধুসন্ত। কত মহাপুরুষ। তাঁদের জীবন ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে নানা অলৌকিক ঘটনা। আধুনিক মানুষ আত্মম্ভরী, অবিশ্বাসী আবার কেউ কেউ যুক্তি-বাদীও। সবকিছু খুঁটিয়ে যাচাই না করে তারা কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। বিজ্ঞানের মানদণ্ডে সবকিছু পরখ করে নিতে চায়। কিন্তু এমন ঘটনা অনেক দেখতে পাওয়া যায় যার ব্যাখ্যা আধুনিক জড় বিজ্ঞানে মেলে না। সব সময় জড় বিজ্ঞানের প্রশ্ন সেখানে শেষ। মহাশক্তির আধার চৈতন্যবিজ্ঞানের উত্তর সেখানে অফুরন্ত। যার নাগাল পাওয়া ভার। তল পাওয়া কঠিন। সাধন পথেই তাঁর খোঁজ পান সাধকেরা।

সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে দেখে দিব্যজ্যোতি নিয়ে কেউ তরল জলের উপর পা রেখে অবলীলায় পার হয়ে যান দুরন্ত পারাবার, কেউ বায়ুভুক। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকেন কিছু না খেয়ে। একই বৃন্তে ভিন্ন জাতের ফুল ফোটান কেউ ইচ্ছানুযায়ী। অসময়ে ফল নিয়ে আসেন ব্রততী শাখায়। কেউ গণ্ডী বেঁধে আটকে দেন সাময়িকভাবে শ্রাবনের ধারা। কেউ মাঝে মাঝে জীবন মৃত্যুকে তাচ্ছিল্য করে পৌঁছে যান অব্যক্ত জীবনে। এ সবই অপ্রাকৃতিক অলৌকিক। আধুনিক বিজ্ঞানের হিসাব এখানে তছনছ।

শ্রীনিবাসকে নিয়ে সেই একই খবর। হিসাব আর মেলে না। সেবার মল্লভূম বিষ্ণুপুরে রয়েছেন শ্রীনিবাস। সঙ্গে রয়েছেন পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়া। রোজকার মত ইষ্টদেব বংশীবদনের পূজা সেরে তিনি বৃন্দাবন লীলা আস্বাদনের জন্য তন্ময় হয়ে বসে আছেন শুদ্ধ আসনে।

এ সময় সমাধি হয় তাঁর। ধ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছে যান অপ্রাকৃতিক জগতে। পড়ে থাকে স্থূল দেহ। এ দেহ দেখলে বোঝা যাবে না জীবিত কি মৃত। কোন স্পন্দন নেই। সকলের কাছে এ অবস্থা কিন্তু অস্বাভাবিক ঠেকেনা কোনদিন। নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার তিনি 'হরি' 'হরি' বলে চোখ মেলে তাকান। রাধা কৃষ্ণের প্রেমকেলি আস্বাদনের পর প্রতিদিন ফিরে আসেন বাহ্য জগতে।

কিন্তু আজ একি হল ? নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল যে ! আচার্য্য প্রভুর সমাধি ভাঙছে না। সম্বিত ফিরছে না কেন ?

দিন কাটে রাত যায়। এযে তিনদিন পার হয়ে গেল !

স্পন্দনহীন নিশ্চল পাথর মূর্তির দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয় ভক্ত দল।

একি নিত্য সমাধি না চির সমাধি।

সংবাদ পেয়ে রাজকাজ ফেলে ছুটে আসেন ভক্তশিষ্য মহারাজ হাম্বির মল্ল।

অন্দর মহলে স্থির থাকতে পারেন না রাণী সুলক্ষণা। উৎকণ্ঠিত, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্বিগ্ন রাণী বেরিয়ে পড়েন অন্দর ছেড়ে। পাষাণ প্রতিমা গৌরাঙ্গপ্রিয়াব পা জড়িয়ে তিনি ডুকরে উঠেন একি হল মা ?

মল্লভূমের রাজধানীতে দলে দলে ভেঙ্গে পড়ে শোকার্ত মানুষ— একি হল ? কেন হল ? কেমন করে চেতনা ফিরবে ? আদৌ ফিরবে কি ?

নানা উদ্বিগ্ন প্রশ্ন ঘুরতে থাকে মুখে মুখে। আচার্য্য প্রভুকে দেখে হাম্বির মল্ল, ব্যাসাচার্য্য, কৃষ্ণবল্লব বল্লভী করিবাজ সকলেই হতাশ হন।

রাজ চিকিৎসক পরীক্ষা করে বলেন—দেহে প্রাণের স্পন্দন আছে। সকলে বিস্মিত হয়—সত্যই তো রামচন্দ্রের হাতে সুগন্ধি তাম্বুল।

এ তাম্বুল কি সত্যই শ্রীমতী রাধিকার দেওয়া। কেমন করে এল তা এই স্থূল জগতে। এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়না সমবেত জনতা। ভক্তি বিনম্রচিত্তে অনুরাগের দোলায় দুলতে থাকে তারা।

নরোত্তমের ভাবসমৃদ্ধ 'গরানহাটী' সুরে সমবেত সংকীর্ত্তনে বেজে উঠে খোল করতাল—

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব।
টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জাবেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া॥
হেন রূপ মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবদয়ে নরোত্তম দাস।

আচার্য্যপ্রভু যখন যেখানে থাকেন বাতাসে খবর পেয়ে তার কাছে ছুটে আসে মানুষ। নানা রকমের লোক। কত রকমের সমস্যা। এক এক সময় ভজন সাধন মাথায় ওঠার জোগাড়। তবু বিরক্তি নেই তাঁর।

আশীর্বাদ করেন আর বলেন—লোভের চকচকে ফলাটা জলে ফেলে দে। যেন আর কুড়োতে না হয়। অনেক হয়েছে বাবা, স্বার্থের ঝোলাটা এবার কাঁধ থেকে নামা: না হলে যে ভার বহেই মরবি। সব শেয়ালের এক ডাক! বলে কিনা বড় কষ্ট। হবে না কেন? কলির মানুষ কেমন ধড়িবাজ, গাড্ডায় পড়লেই রাখো ধরম, পার হলেই 'কিসের ধরম কিসের কি ঠ্যাং ছিল তাই পেরিয়েছি' তাইতো বলি বাবা! উপরওয়ালাকে বোঝাবে কি? বাঁচবে যদি সব ছেড়ে রাগ

অনুরাগকে মূলধন করো। হৃদয়কে রসে ভিজিয়ে ভালবাসার ব্যবসা কর,.লাভের পাহাড় জমে যাবে দেখতে দেখতে।

সহজ সরল কথাতে চৈতন্য ফিরে পায় মানুষ। গম্‌গমে লোক-জনের ভিড়ে এমনি একদিন যাজিগ্রামে বসে আছেন আচার্যপ্রভু। পাশে রয়েছেন নরোত্তম, রামচন্দ্র, এমন সময় ঝড়ো কাকের মত সেখানে এসে দাঁড়াল রামচন্দ্রের ভাইপো দিব্যসিংহ।

দিব্যসিংহ গোবিন্দ'র ছেলে। বাড়িতেই থাকে বিষয় আশয় দেখাশোনা করে। বাবা গোবিন্দ বাড়িতে থাকলেও সংসারের বিশেষ কিছু দেখে না। একটু ভাবুক প্রকৃতির, কবি কবি ভাব। মায়ের পূজারী। সংসারী হয়েও সংসারের ঝুট ঝামেলা তার ভাল লাগেনা।

বাবা চিরঞ্জীব সেন ছিলেন গৌর ভাবের ভাবুক অল্পবয়সে মারা গেছেন। স্বনামখ্যাত মাতামহ দামোদর পণ্ডিতের সান্নিধ্যে বুধরীতে মানুষ হয়েছেন ছোটবেলা হতে। বাড়িতে রয়েছে নারায়ণ শীলা সেই সঙ্গে শক্তিরূপা মায়ের প্রতিমা। মাতামহ শক্তির উপাসক। স্বাভাবিক-ভাবে মাতামহের প্রভাব পড়েছে ছোট ভাই গোবিন্দের উপর।

রামচন্দ্র—গোবিন্দ, দুই ভাই দু'রকমের। পৃথক চিন্তা। ভিন্ন আচরণ। একজন বৈষ্ণব, আরজন শাক্ত। রামচন্দ্র পিতার মত গৌর ভাবের ভাবুক। সে থাকে আশ্রমে, বাড়ির সাথে যোগাযোগ কম। বার বার তাগাদা দিয়ে কখনও গুরু শ্রীনিবাস, কখনো সাথী নরোত্তম বাড়ী পাঠায় তাকে।

এবার অনেকদিন হল বাড়ি হতে ফিরেছে, কে কেমন আছে সঠিক জানে না। শুনেছিল অনুজ গোবিন্দের শরীর ইদানিং তেমন ভাল যাচ্ছিল না। পেটের গোলমাল, যা' খায় হজম হয়না, আম পায়খানা। হজম না হলে শরীর টিকবে কেমন করে! ভাবনার কথা, তাহলে তার কি কিছু হয়েছে? ভাইপো দিব্যকে দেখে চমকে ওঠে রামচন্দ্র। বলে —কিরে, কি হয়েছে? তোকে এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন? বাড়ির সব ভালত?

—হ্যাঁ, ভালো; সবাই ভালো আছে।

বাবার কথা শুধাতে চোখে জল এসে যায় দিব্যর।

শঙ্কিত রামচন্দ্র উঠে গিয়ে নাড়া দেয় তাকে, কাঁদছিস্ কেন? চুপ করে গেলি কেন? বল কি হয়েছে তোর বাবার?

—বাবা আর বাঁচবে না জেঠু, যা' খায় কিছুই হজম হয় না। জলও আর থাকছে না পেটে। মৃত্যুদূত গ্রহণী রোগে শরীর বিছানায় মিলিয়ে গেছে। সে চেহারার কিছু নেই। চোখ কোটরাগত, দেহ বিবর্ণ, যেন একটা কঙ্কাল। চেনা যায় না। এখন দিনরাত শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে—আর বলছে, ওরে তোরা দাদাকে একটা সংবাদ দে। আচার্যপ্রভু আর তাকে একবার নিয়ে আয়, শেষ দেখা করি।

গোবিন্দ আর বাঁচবে না! গোবিন্দ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে! সে আচার্যপ্রভু আর তার সাথে শেষ দেখা করতে চায়। ভ্রাতৃস্নেহে মন ডুকরে কেঁদে উঠে রামচন্দ্রের—না, কিছুতেই এ হবে না। কিছুতেই তা হতে পারে না। কিছুতেই তা হতে দেবে না সে। গোবিন্দকে বাঁচাতেই হবে।

ভাইপো দিব্যকে ছেড়ে এগিয়ে যায় সে আচার্যপ্রভুর কাছে, বলে প্রভু! গোবিন্দ আজ মৃত্যুশয্যায়। আপনি তাকে সারিয়ে দিন। আপনি দীক্ষা দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করুন তাহলেই সে সেরে উঠবে। আপনি তাকে বাঁচান। সে আমার পরম আদরের। তাকে হারিয়ে যে আমি বাঁচব না প্রভূ!

—কিন্তু সে যে শাক্ত। সে কি আমার কাছে দীক্ষা নেবে?

—কেন নেবে না। কালী-কৃষ্ণ কি আলাদা? আপনিই তো বলেছেন কালী-কৃষ্ণ ভিন্ন নয়। সাধন প্রণালী মানুষের তৈরী। আয়ান ঘোষের কাছে যিনি জগন্মাতা কালী, শ্রীমতীর কাছে তিনিই প্রেমময় কৃষ্ণ। যে যেমন ডাকবে তিনি তেমনি আসবেন। তাছাড়া সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

—বেশতো যাবো। সবই প্রেমময়ের ইচ্ছা।

আচার্য্যপ্রভু বুধরীতে গিয়ে শয্যালীন কঙ্কালসার গোবিন্দকে যুগল

মন্ত্রে দীক্ষা দেন। চল্লিশ বছর বয়সের পর শাক্ত গোবিন্দ নেয় বৈষ্ণব মন্ত্র।

তারপর হতেই অলৌকিক ভাবে ধীরে ধীরে সেরে যায় তার দুরারোগ্য রোগ। শরীরে আসে পরিবর্ত্তন। মনে আসে উৎসাহ, প্রেরণা। কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে তার একটির পর একটি কাল-জয়ী বৈষ্ণব পদ। সম্পদে ভরে উঠে বৈষ্ণব ভাণ্ডার। ভাষা সাহিত্যের মণিমুক্তোর ছড়াতে যা আজও অতুলনীয়।

শ্রীনিবাসের কৃপায় শাক্ত গোবিন্দ হয় পদকর্ত্তা ভক্ত কবি গোবিন্দ দাস। 'সঙ্গীত মাধব' নাটক ও কর্মাবৃত তাঁরই লেখা। তাঁর ভক্তি অর্ঘ্যের একটি ফুল হল—

চলিলা রাজপথে রাই সুনাগরী
ন্যাস বেশ করি অঙ্গে।
ঘৃত-দধি-দুগ্ধে সাজাঞা পসরা
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
বেনন পাটের জাদে বাঁধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী মালে।
সিঁথায় সিঁদুর লোচনে কাজর
অলকা তিলকা চারুভালে॥
চরণ কমলে বাতুল আলতা
বাজন নুপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস ভনে গুরূপ যৌবনে
জিতল নিকুঞ্জ রাজে॥

আচার্য্যপ্রভুর ধ্যান ধারণা, ভাবধারা, আচার-আচরণ সংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে দিগ্বীজয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। মুসলমান সমাজেও পড়েছিল তার ছাপ।

একদিন আচার্য্যপ্রভু স্নান করছেন মুর্শিদাবাদ গঙ্গার ঘাটে। তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মুসলমান ধর্মযাজক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখছে হিন্দু ব্রাহ্মণের স্নান বিধি। নিষ্ঠা দেখে কৌতুহল হয় তার একটা টান অনুভব করে লোকটির প্রতি। কিন্তু কিছু বলে না।

আচার্য্য প্রভুর খেয়াল নেই। ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙ্গে তীরে উঠে একমুহূর্তে থমকে দাঁড়ান তিনি।

পথ হতে সরে দাঁড়ায় গৌড়ের শাসনকর্তা আলালদ্দিনের বংশধর মুসলমান ধর্মযাজক সৈয়দ মুর্ত্তজা।

আচার্য্য প্রভু বলেন, সরে দাঁড়ালে যে, শরীর দূরে নিয়ে গেলেও মন কি সব সময় দূরে থাকে ?

এ আবার কি কথা ! কোন হিন্দু ব্রাহ্মণের মুখ থেকে এমন কথা তো সে শোনেনি কোন দিন।

সৈয়দ মুর্ত্তজা বলে আপনি সদ্য স্নান সেরে উঠছেন। আমি মুসলমান। বিধর্মী।

ব্রাহ্মণ বলেন, মন শুচি তো সব শুচি। ধর্ম একটা পথ, কোনটা গলি পথ, কোনটা রাজপথ ! পথ কি কখনও অশুচি হয়। খারাপ হয়, সব গিয়ে পৌঁছেচে অনন্তলোকে। তুমি অন্য পথে হাঁটছ তাই বলে অস্পৃশ্য হবে কেন ? ব্রাহ্মণ এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন সৈয়দ মুর্ত্তজাকে। বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করে সে। চুম্বকের টানে বিবর্ণ মুর্ত্তজা বলে, প্রভু আমায় দীক্ষা দিন। আচার্য্য প্রভু দীক্ষা দিয়ে তাকে নিয়ে আসেন বৈষ্ণব ভাবধারার সাধন মার্গে। শিষ্য সৈয়দ মুর্ত্তজা, উপশিষ্য নসীর মামুদ পদকর্ত্তা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

তার নিবেদিত ভক্তি অর্ঘ্য—

শ্যাম বন্ধু চিত্ত নিবারণ তুমি।
কিবা শুভক্ষণে দেখা তব সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
আচার্য্য মুখেতে যে ক্ষণে শুনেছি
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগার প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥

মোরে দয়া কর দেহ পদছায়া
শুনহ পরান কানু।
কুলশীল সব ভাসাইব জলে
প্রাণ যায় তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মুর্ত্তজা মাগে পদে স্থান
নিবেদন শুন হরি।
সকল ত্যজিয়া রব তোমা পাশে
জীবন মরণ ভরি ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু এখন পরিতৃপ্ত। কান পাতলেই এখন তিনি শুনতে পান খোল করতাল আর সুধামাখা হরিনাম। বুঝতে পারেন পথ খুঁজে পেয়েছে অসহিষ্ণু তাপদগ্ধ পথহারা মানুষ।

পুলকিত মন নিয়ে খুশী হয়ে তিনি দেখেন, পশ্চিমের হলুদ সূর্য্য যখন মুঠো মুঠো আবির ছড়াতে ছড়াতে নীড়ে ফেরা উড্ডীন পাখ-পাখালির ডানায় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ছে তখন দিনান্তের কাজ শেষ করে সবুজ মেঠো আলপথ দিয়ে একে একে ঘরে ফিরছে ক্লান্ত সংসারী মেহনতী মজুর। অভাব যে নেই তা নয়। কিন্তু সবার মন হতে অভাববোধ যেন গেছে। মানুষগুলো ক্লান্তির বোঝা নামিয়ে দলে দলে নক্ষত্রখচিত খোলা আকাশের নিচে হরিসভার আঙ্গিনায় যোগ দেয় নিয়মিত। এরপর উদাত্ত সুরে শুরু হয় হরিনাম।

'দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া
কীর্ত্তন করহে সবে'—

গয়া হতে ফিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে নির্দেশকে জীবনের সার করেছে তারা আজ।

তাদের আর নবাবী চাবুক নিয়ে বাধা দিতে আসে না মদগর্বী কাজী। বাধা দিতে আসে না হিন্দু অবিশ্বাসীর দল।

নাম-ই শ্রীকৃষ্ণ। নাম-ই কলির মানুষের উদ্ধারের মহামন্ত্র। 'নামের সহিত সদা ফেরেন শ্রীহরি।' সেই নামের মহিমায় জেগে উঠেছে আচণ্ডাল মানবাত্মা। দ্বেষ, ঘৃণা, ভয় হয়েছে জয়। ভালবাসা

আর অহিংসার প্রভাবে জাগ্রত আত্মার প্রতিরোধে থেমে গেছে। হিংসার উদ্যত ছুরি। কাজীর কাজিয়া অকেজো হয়ে গেছে অনুচ্চারিত শান্ত প্রতিবাদে।

সাঁঝের কোলাহলহীন পরিবেশে ভেসে আসা হরিনামের মিঠে সুরে শ্রীনিবাসের চোখে মুখে ফুটে উঠে পরম প্রশান্তি।

শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর শরীর দুর্বল হয়ে আসছে দিন দিন। বয়সের ছাপ পড়েছে। দেহে শোনা যাচ্ছে মহাকালের পদধ্বনি। আগের দুরন্ত গতি আর নেই। চলাফেরা সহজ সচ্ছন্দ হলেও কিছুটা মন্থর। মনের সাথে পাল্লা দিয়ে দেহ আর অহরহ ছুটাছুটি করতে পারছে না। উপর হতে দেখলে তেমন কিছু বোঝার উপায় নেই। বিভক্ত প্রহর শুধু কাটে নির্দিষ্ট কাজে আর ভজন সাধনে। মূল্য দিয়ে সময়ের চুলচেরা হিসাব চলে।

এক এক সময় জনহীন নিশীথে সুরের ঝর্ণাধারায় তাঁর সমাহিত মর্মলোকে কে যেন যমুনা পুলিন হতে থেকে থেকে বেনু বাজায়। পাগল করা, উদাস করা রাখালিয়া সেই বেনু। যে বেনু যুগান্তের সীমা ছাড়িয়ে বিরহী বিরহীনিকে মিলন সাগরে স্নান করিয়ে শীতল করে দেয়।

শিরা উপশিরায় এক এক সময় তাঁর থর থর করে কাঁপতে থাকে নীল যমুনার অপরূপ প্রতিবিম্বিত নীলরূপ। স্পষ্ট তিনি দেখতে পান চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছেন। মুগ্ধনেত্রে তিনি দেখতে থাকেন সেরূপ মাধুরি—

'বিনা মেঘে ঘন আভা পীত-বসন শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া জোসূতী মুকুতা বেড়া
মত্ত ময়ূর পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্বমালা জিনিয়া মদন কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।'

শ্রীনিবাস এবার টান অনুভব করেন বৃন্দাবনের, দিন যত ঘনাতে থাকে আকর্ষণ ততো বাড়ে।

হৃদয়ের পূতমন্দির হতে তিনি শুনতে পান পরমপুরুষের ডাক : ওরে, আর কেন! এবাব ফিরে আয় যারা আলোর ছোঁয়া নিয়ে চলতে শুরু করেছে তাদের স্বাবলম্বী হতে দে। দেখিস কালো আস্তবণকে পিছনে ফেলে ওরা ঠিক আগামী দিনে পৌঁছে যাবে ইপ্সিত লক্ষ্যে। ওদের নিয়ে ভাবার কি আছে?

বুকভরে বাতাস টেনে শ্রীনিবাস হাল্কা হয় কিছুটা। প্রিয়তমকে মনে মনে প্রণাম কবে নিজেকে নিজেই বলেন : ঠিকই তো। মিছিমিছি কষ্ট পাওয়া। না, আর নয়।

এবার গোছগাছের পালা। সামনে দোল পূর্ণিমার শুভদিনে খেতুরির উৎসব। এ উৎসব সেরে এসেই তিনি পাড়ি জমাবেন সংসারের অকুল পারাবার হতে বন্দরের অভিমুখে।

উতলা মন তার স্বপ্ন দেখে অনন্ত পুরুষের।

খেতুরির বাৎসরিক উৎসব সেরে শেষে শ্রীনিবাস নরোত্তমকে একান্তে ডেকে বলেন : বৃন্দাবনের বাঁশী বার বার আমায় ঘরছাড়া করেছে। আবার সে ডাক পাঠিয়েছে। মনও বড় উতলা। বড় ক্লান্ত। ভাবছি প্রেমের পদধূলিপূত ধুলো মাথায় তুলে ধন্য হব।

আচার্য্যপ্রভুর একথা শুনে নরোত্তম হকচকিয়ে যায়। বয়সের ভারে ঐ তো শরীর। এসময়ে প্রভুর একি অভিপ্রায় ভেবে পায় না সে। কোন রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে এ সিদ্ধান্তের পিছনে!

সজল চোখে সে বলে : আপনাকে বাধা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। এতটা পথ। পথের ধকলও কম নয়। শরীর কতটা সইবে জানি না। এখন না গেলে কি নয়!

শ্রীনিবাস নরোত্তমেব বিষাদভবা নতমুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন তার অবস্থা।

সস্নেহে জড়িয়ে ধরে তাকে বলেন : তুমি পণ্ডিত। তুমি সাধক। তোমাকে বোঝাবার কিছু নাই। অনিবার্য্যকে নিয়ে এতো ভাবার কি

আছে। মিছেই ভাবছ। তাছাড়া রামচন্দ্রকে সাথে নিয়ে যাব। ওতো সব অবস্থাতে সাথে সাথেই থাকবে।

নরোত্তম বোঝে বাধা দেওয়া বৃথা। যুগান্তের পথিককে সে আটকে রাখবে কি দিয়ে! কিন্তু নিত্যসঙ্গী প্রাণের রামচন্দ্র সেও ছেড়ে যাবে। নরোত্তমের সব শূন্য মনে হয়। সব ভাষা তার কে যেন হরে নেয়। হারিয়ে যায় কথার খেই। মুখ তোলে না সে।

শ্রীনিবাস তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে যান যাজিগ্রামে।

সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ আর গোছগাছে কেটে যায় কিছুদিন। আবার শুরু হয় পথচলা।

শ্রীনিবাসের বহির্মুখি সত্তা তাঁকে আবার ডেকে নামায় পথের টানে। কে যেন ভেতর হতে অনুপ্রেরণা জোগায়ঃ কাজ করে যাও। ফলাফলের দিকে তাকিও না। এ জীবন গতিময়। ঐশ্বর্য্যময়। থামতে নাই। থামার অর্থ মৃত্যু। কে বরণ করবে পৌরুষহীন অলস মরণকে!

চরৈবেতি। চরৈবেতি।

এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও।

এগিয়ে চলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু। সাথী তাঁর রামচন্দ্র। নিত্য আনন্দের চুম্বন নিতে বেরিয়ে পড়েছেন অনন্ত কালের কালজয়ী পথিক মহাকালের ডাকে।

পিছনে পড়ে থাকে বাল্য-কৈশোর-যৌবন আর কর্মময় জীবনের স্মৃতিবিজড়িত যাজিগ্রাম। পড়ে থাকে মল্লভূম, খেতুরি আর সবুজ স্নেহমমতা জড়ানো জন্মভূমি চাকন্দির গাছপালা-পশুপাখি প্রিয় সান্নিধ্যহারা সংজ্ঞালুপ্ত মানুষ। দেখতে দেখতে তাঁদের ক্রমশঃ চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে বাংলার সবুজ ক্ষেত, সজল মাটি, বুকভরা সোনালী সম্ভার। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে বাংলার নাম না জানা কীর্ত্তনীয়ার উদাত্ত কণ্ঠে মোহময় সুরের জীবন দর্শন—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত নহিতুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওয়ত, সাগর লহরী সমানা॥"
তাঁদের গমন পথের খাঁ-খাঁ রিক্ত দিগন্তের দিকে তাকিয়ে
বিরহ পীড়িত মানুষের মুখ দিয়ে বেদনায় বেরিয়ে আসে—

তস্যা এবো মৃগীদৃশো মনসিজ প্রেঙ্খ কটাক্ষশুগ
শ্রেণী জর্জ্জরীতং মনাগপিমনো নাপ্তাপ্রিসন্ধুক্ষতে॥

(গীতগোবিন্দ ৩/১২)

চোখের জলে তারা বলে ঃ হে কন্দর্প! তুমি আর ফুলশর ছুঁড়ো না তোমার খেলায় বিশ্ব যেখানে পরাজিত সেখানে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে আঘাত করে তোমার আর কি পৌরুষ বাড়বে। মৃগনয়নীর কটাক্ষে জর্জ্জরিত হৃদয়মন আমার অস্থির অসুস্থ।

এ বিরহ বেদনা নিয়ে, অস্থিরতা নিয়ে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না কারো। তবু ফিরতে হয়। এটাই নিয়ম। এটাই বিধাতার পরিহাস।

এরপর কাটতে থাকে এক একটি দিন। এক একটি দিন নয় এক একটি যুগ।

দেখতে দেখতে শারদীয়া পূজার আরতি শেষ হয় গ্রামে গ্রামে। করুণ একটানা বিলাপে থেমে যায় বিজয়ার বিদায়ী সানাই। সকালের অবুজ দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে শরতের ছেঁড়া কুয়াশায়। হেমন্তের টুপ-টাপ, টুপ-টাপ শিশির ঝরা রাতে সিক্ত হয় হৃদয় কন্দর। গৌড় বাংলার বুকে বইতে শুরু করে ঝোড়ো বাতাস। আচার্য্যপ্রভু কেমন আছেন? কখন দেখা হবে আর! কবে ফিরবেন?

এ বিরহ যে অসহনীয়! বিরহের ব্যপ্তি যে কতখানি, কতো যে তার জ্বালা, মর্মে মর্মে তা অনুভব করে গৌড় বাংলার প্রতিটি লোক। আশায় আশায় দিন চলে যায় রাতের কোলে।

আশা মায়াবিনী। আশা কুহকিনী। আশা দূরমায়া-মরিচীকা। আশা হাসে। কাঁদে। শুধু কাঁদায়।

কিন্তু শ্রীনিবাস আর ফেরেন না। বিরহের সাধনায় মিলনের সবুজ

সংকেত আসে তার অনন্ত লোক হতে। কার্তিকী শুক্ল অষ্টমী দিনে ৮৪ বৎসর বয়সে মহাসাধকের কর্মময় জীবনদীপ বৃন্দাবনের যমুনাকূলে মিশে যায় জ্যোতির্ময়ের সীমাহীন জ্যোতিতে। প্রেমময়ের অনন্ত রূপরাশি, প্রেমমাধুরি তিনি দুহাত ভরে সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে ফিরে যান আপন আবাসে।

আচার্য্যপ্রভু মানবলীলা সম্বরণ করেছেন এ দুঃসহ সংবাদে নরোত্তমের সাথে হাজার হাজার মানুষ ভেঙ্গে পড়ে বোবা কান্নায়—

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
তার সঙ্গ বিণা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আছিনু যাঁহার পাশ
কথাশুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের কথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

গৌড় বাংলার গৃহীসাধক শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু চলে গেলেন। রেখে গেলেন বিরহ বেদনা আর একনদী কান্না। আমাদের দিয়ে গেলেন তাঁর আজীবনের সঞ্চয় ভাণ্ডার উজাড় করে। দেখিয়ে গেলেন বিরহের আর্তি নিয়ে ভগবৎ সাধনার সোজা পথ।

আজও তাই নীল যমুনার বিম্বিত মুকুরে আশা জাগায় সাধের 'শ্রীনিবাস কুঞ্জ'।

যমুনার কুলু-কুলু স্বরে কান পাতলেই আজও শোনা যায় তার বিনানিন্দিত কণ্ঠের অভয়বাণী—

—আমি আছি। তোমরা আছ। আছে আদর্শ। আছে প্রেম, ভালবাসা, শুচিতা। ভয় কি! এগিয়ে চলো। নাম-ই মন্ত্র। নাম-ই কলির শেষ অবলম্বন।

হৃদয়কে ফুলে ফুলে সাজিয়ে চোখের জল মুছে চলো। আমরা সবাই এগিয়ে চলি প্রেমের গান গেয়ে। স্বর্গকে ছিনিয়ে আনি ধরার ধুলোয়।

সমাপ্ত